Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

''...বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তিহননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।'' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস... ১

দেশে বিদেশে ২

সাম্রাজ্যবাদী দ্বিচারিতা ... ৩

উন্নয়নের কয়লাখনি...ধোঁকা ৪

ভারতের মেয়েদের অবস্থান ৫

ধনকুবেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি ৬

২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে মমতার গেম প্ল্যান ৭

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ আর এস পি'র বক্তব্য ৮

68th Year 46th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 5th March 2022

সম্পাদকীয়

পুতিন, জার না হিটলার?

কম লেনিন তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তাতে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কয়েকটি গুরুতর সমস্যাই তুলে ধরেন নি। রোগশয্যায় তিনি দলীয় নেতৃত্বের বিচ্যুতি এবং সংশোধনের পথ নির্দেশ করার জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি একটি চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে মূল রাশিয়া এবং জার আমলে শাসিত ছোট রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে বলেছিলেন যে বড় রাষ্ট্রগুলি এতদিন পর্যন্ত সীমান্তবর্তী ছোট রাষ্ট্রগুলিকে দমন করেছে। সেই দেশের মানুষকে শোষণ করেছে। অনেকটা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মতো।

লেনিনের দেহাবসানের পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ইউক্রেনের উপর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য কার্যত গণহত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছেন স্ট্যালিন অনুগামী লেমকিন। বুদ্ধিজীবীদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। গীর্জাগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সহস্র সহস্র মানুষকে শ্রম শিবিরে পাঠানো হয়েছে। ১৯৯১ সালের অগস্টে উদারপন্থী গর্বাচভ সাময়িকভাবে ইউক্রেনকে স্বশাসন ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই অপসারিত হয়েছেন।

২০০০ সালে পুতিন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করার পর শুধুমাত্র স্যাঙাত পুঁজিপতি ও আন্তর্জাতিক কর্পোরেট সংস্থাসমূহের স্বার্থে মূল রাশিয়ার গণতন্ত্রই ধ্বংস করেন নি। মহাপ্রতাপশালী জার সম্রাটদের মতোই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

ইতিমধ্যে ১৯৯৪ সালে আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইংলন্ড ইউক্রেনকে পরমাণু শক্তি ব্যবহার থেকে বিরত থাকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। কিন্তু পুতিনের নেতৃত্বে রাশিয়া এই চুক্তিভঙ্গ করে। ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের বিষয়টিকে বুড়ো আঙুল দেখায়। এবারের আগ্রাসনে রাশিয়ার মরণপণ যুক্তি, জারের আমলের মতো ইউক্রেন রাশিয়ারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লেনিন যে অর্থে ইউক্রেন প্রমুখ দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং যে কোনো মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছিলেন পুতিনের যুক্তিতে তা নাকি ভ্রান্ত ছিল। স্ট্যালিন, পুতিনের ভাষ্যে, ইউক্রেন সম্বন্ধে যে নীতি নিয়েছিলেন, তা নাকি অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে ইউক্রেনকে রাশিয়ার অঙ্গীভূত করার জন্যই তিনি যুক্তি সাজিয়েছেন। আমরা মনে করি এই যুদ্ধ কোন পক্ষেরই ন্যায়যুদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ সংকটই এর কারণ। ইউক্রেন এবং রাশিয়া শুধু নয়, দেশে দেশে পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের মরণপণ সংগ্রাম এবং স্ব স্ব দেশে শান্তির দাবিতে আন্দোলনই এখন বিশ্বের শোষিত মানুষের একমাত্র কর্মসূচি।

মোদীর ভণ্ডামি

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ফেরত আনার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা সীমাহীন ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছেন। রুশ-ইউক্রেনের মধ্যে যখন সাজো সাজো রবে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তখন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসেছিলেন। আর আজ চরম ক্ষুধা অনিদ্রা মৃত্যুভয়ে বিপর্যস্ত ছাত্রদের একাংশকে মাত্র দেশে ফেরত আনার পর, সমস্ত প্রচারের আলোটাই ফেলতে উন্মুখ এঁরা উত্তরপ্রদেশের ভোটের ময়দানে। দিল্লি বিমানবন্দরে গোলাপ দিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।

অথচ ভারতীয় দূতাবাস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কার্যত ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ। বরফে আচ্ছাদিত রণাঙ্গনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে সীমান্তে পৌঁছোনোর মরীয়া চেষ্টা করছেন ছাত্রছাত্রীরা। ইউক্রেনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আতিথ্য নিয়ে ভোগবিলাসের আবহে উত্তেজনার আগুন পোহাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। এঁরা নাকি ছাত্রদের উদ্ধারের আয়োজন করতে গেছেন!

এদিকে তাঁর মন্ত্রীসভা শুধু নয়, বিজেপি'র নেতানেত্রীদের অনেকেই ছাত্রদের পড়তে যাওয়া নিয়ে অকথা কুকথা বলছেন। আবার সরকারের তরফ থেকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যুদ্ধকালে বা বিমানহানায় কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়।

প্রচারসর্বস্ব নির্লজ্জ এই সরকার এক কথায় স্বদেশের মতো, বৈদেশিক নীতি প্রণয়নেও অপদার্থ। ন্যাটো হোক আর রাশিয়া হোক, এদের যুদ্ধকেন্দ্রীক অর্থনীতি রাজনীতির কনিষ্ঠ শরিকরূপে যা করা উচিত, তাই করছে নরেন্দ্র মোদী। কারণ অস্ত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ, যুদ্ধ বিমান এবং জাহাজের খদ্দের যে নরেন্দ্র মোদী। সাপও মারছেন না, লাঠিও ভাঙছেন না।

মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বস্তরে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে

নির্বাচন না প্রহসন—

সদ্য সমাপ্ত শতাধিক পৌরসভার ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি। পরের দিনে একান্ত দাসানুদাস ছাড়া সবকটি সংবাদপত্রই প্রথম পাতায় মন্তব্য করেছিল ভোটের নামে প্রহসন। ছাপ্পা ভোট, রিগিং, বুথ দখল ইত্যাদি হয়েছে অকাতরে। তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত পেশীশক্তিতে বলীয়ান সমাজ বিরোধীরা সারাদিন ব্যাপী দাপাদাপি করল কেন্দ্রে কেন্দ্রে। এই সব জঘন্য সমাজবিরোধীদের সামনে প্রতিরোধের প্রাচীর অনেকক্ষেত্রেই গড়ে উঠতে পারে নি। সহজ হিসেব।

রাজ্যের পুলিশ বাহিনী এবং সাধারণ প্রশাসন নবান্নের নির্দেশমত সশস্ত্র গুন্ডাদের পক্ষে। কার এত সাহস হবে যে, এমন অপশক্তির বিরোধিতায় সুদৃঢ় অবস্থান নেবে? মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দেবে। কোনো পক্ষ থেকে তেমন বাধা না এলে তো বলা যায়, ভোট হয়েছে নির্বাধ। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার জলাঞ্জলি দিয়ে নবান্নের লুম্পেন বাহিনীকে দিয়েই ভোট করালেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর একশ শতাংশ পৌরসভা ও পৌরনিগমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চাই। তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণীই তো গণতন্ত্র!

এমনই গণতন্ত্রের অপার মহিমা পশ্চিমবঙ্গে। বিগত এক দশকেরও বেশিকাল ব্যাপী তা-ই চলছে। গণতন্ত্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে যারা ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতা দখল করছিল, সেই শক্তি মানে তৃণমূল কংগ্রেস, কোনও পর্যায়েই গণতন্ত্র মেনে চলে না। এ কোনও অক্ষমের বিলাপ বা আর্তনাদ নয়। বাস্তব সত্য।

আরও মনে রাখা ভাল যে, এই ১০৮টি পুরসভার অধিকাংশই বেশ দীর্ঘকাল যাবৎ নবান্ন নিয়োজিত প্রশাসকগণ ক্ষমতায়। বকলমে তৃণমূলী শাসন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার প্রসঙ্গটি একান্তই স্বাভাবিক। অথচ গণতন্ত্র চলছে। এমন গণতন্ত্রের বহর দুনিয়াকে দেখিয়েছিল চরম ফ্যাসিবাদী মুসোলিনি, হিটলার কিংবা স্পেনের সামরিক শাসক ফ্র্যাঙ্কো। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতেও অগুন্ত পিনোশে একই অপরাধ করে গেছেন।

পুর নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের তেমন কোনও অর্থই নেই। ভোটের নামে প্রহসন। তার আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কী হতে পারে! গণতান্ত্রিক পদ্ধতির এমন চূড়ান্ত অপলাপ অদূর ভবিষ্যতে অন্য গণতান্ত্রিক দলগুলিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে উদাসীন করতেই পারে। এসব কি কোনও সভ্য সমাজে চলতে পারে নাকি? রাজ্যের মানুষ ভাবুন। যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তাঁরাই। সে পথ হয়তো রক্তপিচ্ছল হয়ে উঠতেই পারে।

দেউচা পাচামির কয়লাখনি প্রকল্প—

অকাতরে অনবরত মিথ্যাপ্রচার নবান্নের একমাত্র অভিজ্ঞান। পরিবেশ বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত কোনও সমীক্ষা নেই। ছাড়পত্র তো পরের বিষয়। কয়লাখনি আদৌ হবে কিনা সন্দেহ, হলেও তা যে বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে অতি উচ্চপ্রযুক্তির মাধ্যমে হবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

অসংখ্য দরিদ্র মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে অবশেষে ব্যাসাল্ট বা গ্রানাইট পাথরের বিপুল ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়টি বাস্তব সত্য। ইতোমধ্যে নরেন্দ্র মোদির অতিঘনিষ্ঠ তাঁবেদার পুঁজিপতি গৌতম আদানি নবান্নে একান্ত গোপন বৈঠক করে গেছেন নেত্রীর সঙ্গে। এই বিশালাকার কর্পোরেট কোম্পানি কয়লা উত্তোলনের নামে পাথর খাদানের ব্যবসা করবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনুঘটক। মোদির পছন্দই তাঁরও পছন্দ। সংকটগ্রস্ত আগ্রাসী পুঁজিবাদের একান্ত অনুচর উভয়েই। সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার কোনও দায়ই এদের নেই।

নরেন্দ্র মোদি যেমন বছরে ২ কোটি মানুষের চাকুরির ব্যবস্থা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সবটাই ধোঁকা বলে প্রমাণ করেছেন; তাঁর বিশিষ্ট স্যাঙাৎ নবান্নের নিয়ন্ত্রকও একই ভাবে দেউচা পাচামি প্রকল্পের মতো একটি পুঁজি নিবিড় প্রকল্পে লক্ষাধিক মানুষের চাকুরির বিষয়ও এক নির্লজ্জ 'জুমলা'।

কোল ইন্ডিয়ার তথ্য (২০২১ সালের হিসেব) বলছে যে বার্ষিক ৬০ কোটি টন কয়লা উত্তোলনে সব মিলিয়ে কর্মসংস্থান হয়েছে ২ লক্ষ ৭২ হাজার। আর দেউচা পাচামিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পে ৮ কোটি টন কয়লা তুলতে লক্ষাধিক চাকুরি হবে, এটা এক নির্জলা মিথ্যা। সহজ হিসাবেই বোঝা সম্ভব। নবান্নের দাবি বিলকুল অসত্য। বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এসব কথা জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করে গরীব আদিবাসী এবং পশ্চাদপদ মানুষদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তাঁদের চাষের জমি হয় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে অথবা খোলামুখ কয়লা খনি করে অদূর ভবিষ্যতেই বিস্তীর্ণ এলাকায় অপরিবর্তনীয় সমস্যা তৈরি করছে।

এমন ধ্বংসাত্মক প্রকল্প কোনভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যে মানুষ সাধারণের স্বার্থে দেউচা-পাচামি প্রকল্পের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন তাঁদেরই উদ্দেশ্যমূলক ভাবে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে দিয়ে দীর্ঘকাল কারাগারে আটক করা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও তো গণতন্ত্রের বিপন্ন হবার প্রসঙ্গ ওঠে। নবান্ন যে গ্রামাঞ্চলে নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় নিকৃষ্টতম কাজেও নবান্ন দ্বিধান্বিত নয়। তার প্রকৃত কারণ বুঝতে অসুবিধা হবার কোনও কারণ নেই।

আনিস খানের নৃশংস হত্যা ও তারপর—

রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের এগিয়ে থাকা কর্মী আনিস খানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তৃণমূলী ঘাতকবাহিনী। তদন্তের নামে যথারীতি তথ্য গোপনের জঘন্য পথে নবান্ন। যাঁর নির্দেশে এবং যাদের দ্বারা এমন ভয়াবহ হত্যাকান্ড সংঘটিত হল, তারাই এই খুনের তদন্ত করার দায়িত্বে। যত দিন যাচ্ছে ততই বোঝা যাচ্ছে যে, আসলে এই পূর্বপরিকল্পিত নৃশংস হত্যার যথার্থ বিচার করা নবান্ন'র উদ্দেশ্য নয়। এ চলতে পারে না।

এমন এক ভয়ঙ্কর অনৈতিকতার বিরুদ্ধে রাজ্যের ছাত্র যুবরা পথে নেমে তীব্র প্রতিবাদে সামিল। রাজ্য বামফ্রন্টও গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ করছে যে, নবান্ন ক্রমাগত আনিস খানের হত্যা নিয়ে অতি নিম্নরুচির রাজনীতি করে চলেছে। ইতোমধ্যে লোকদেখানো যে দু'জন পুলিশ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা সরাসরি দাবি করেছে যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া তারা

এর পর ৮ পাতায়

চিন-পাকিস্তান সম্পর্ক

রাহুল গান্ধী সংসদে এন ডি এ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন এন ডি এ সরকারই পাকিস্তান ও চিনের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে অনুঘটকের কাজ করছে। ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত বিদেশ নীতি ছিল এই দুই দেশের মধ্যে নৈকট্যের সম্পর্ক যেন কোনওভাবেই তৈরী না হয়। রাহুল গান্ধীর অভিযোগের জবাবে বর্তমান বিদেশ মন্ত্রী এম জয়শঙ্কর বলেছেন ইতিহাস এবং বাস্তব ঘটনা সাক্ষী, বিগত বেশ কয়েক দশক ধরেই চিন এবং পাকিস্তান মৈত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষী যে, ১৯৪৭ সালের পর ভারত আগে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনকে স্বীকৃতি দিলেও, মাত্র কয়েক বছর পরেই ১৯৫১ সালে পাকিস্তান চিনকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু পাকিস্তান সিয়াটো এবং সেন্টোর কম্যুনিস্ট বিরোধী সামরিক জোটের সদস্য ছিল। অপরদিকে মাও- সে-তুং-এর দেশ চিন ছিল সোভিয়েত ব্লকে।

ভারতের সঙ্গে চিনের মৈত্রী সম্পর্ক হিন্দি-চিনি ভাই ভাই-এর যুগে আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এই দুই দেশই ঔপনিবেশিক শক্তি বিরোধী এবং নিরপেক্ষ বিদেশ নীতির সূত্রধর ছিল। ১৯৫০ সালে চিনা সেনা তিব্বতে উপস্থিত হলে, পাকিস্তান, আমেরিকা বিমানবহরকে পাকিস্তানের উপর দিয়ে যোগাযোগের সুবিধা দিয়েছিল এবং সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে তিব্বতী বিদ্রোহীদের সাহায্যও করেছিল।১৯৬২ সালের চিন ভারত সংঘর্ষের পর চিন রণনৈতিক কারণেই সম্ভবত পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হয়। ১৯৬২ সালের অনভিপ্রেত ঘটনার পর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার সাহস সঞ্চয় করেছিল সম্ভবত। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান এবং চিনের মধ্যেও সীমানা চুক্তিতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের এক অংশ সাকাশাম উপত্যকা চিনের হাতে তুলে দেয়, এই অঞ্চলটিতে ভারতের দাবি থাকলেও বাস্তবে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সীমান্ত নিয়ে এই চুক্তিটি ৭০-র দশকে চিন ও পাকিস্তানের দ্বারা যৌথভাবে নির্মিত কারাকোরাম হাইওয়ে নির্মাণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭০ এর দশকেই চিনের সঙ্গে পাকিস্তানের দোস্তি শুরু হয় যখন পাকিস্তানের তদানীন্তন শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জারদের সঙ্গে চিনের মাও জে দঙ এবং চৌ এন লাইয়ের এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ দূতের কাজ করেন। এই যোগাযোগের ফলে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে কিসিঞ্জার গোপনে চিন সফর করেন। কিসিঞ্জারের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকা এবং চিনের বিরোধের কারণগুলি আলোচনা এবং সমাধান সূত্র বের করা।

১৯৭৪ সালে ভারতের সফল পারমাণবিক পরীক্ষার পরে পাকিস্তানের এই উদ্যোগে পারমাণবিক সহযোগিতার জন্য চিন-পাকিস্তান সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও চিনের মধ্যে পারমাণবিক সহযোগিতার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি পাকিস্তানে রপ্তানিতে চিন রাজী হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণে সহযোগিতা করে। ১৯৯৮ সালে ভারতে সফল পারমাণবিক পরীক্ষার কিছুকাল পরেই পাকিস্তানও মূলত চিনের সাহায্যের ফলেই সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধীর চিন সফর ছিল ভারত চিন সম্পর্ক নতুন করে নির্মাণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। রাজীব গান্ধীর এই সফরের পরবর্তী সময়ে চিনের পররাষ্ট্র নীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যা পাকিস্তানের কাছে মোটেই স্বস্তিদায়ক ছিল না। চিন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সঙ্গে নতুন করে আলাপ আলোচনা শুরু করে। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আলাদাভাবে আলোচনার ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৬ সালে তদানীন্তন চিনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিনের পাকিস্তান সফরকালে চিনের প্রেসিডেন্ট কাশ্মীর প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনার পরিবর্তে এই দুই দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যাটি সমাধানের কথা বলেন, যা পাকিস্তানের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব ছিল না। ১৯৯৯ সালে কার্গিল সংঘর্ষের সময় ইসলামাবাদের প্রতি চিনের পরামর্শ ছিল পাকিস্তান যেন সেনা প্রত্যাহার করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। ঐ বছরেরই জুলাই মাসে চিনের বিদেশমন্ত্রী পাকিস্তান এবং ভারতকে কাশ্মীরের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে মান্যতা দিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরামর্শ দেয়। কার্যত লাহোর ঘোষণাকে মান্যতা দেওয়ার পরামর্শ চিন পাকিস্তানকে দেয়। চিনের বিদেশমন্ত্রীর এই পরামর্শ পাকিস্তানের কাছে ছিল, এক বড় চপেটাঘাত, ২০০২ সালে ভারতের সংসদে জঙ্গি হানা। ২০০৮ সালে মুম্বাই শহরে জঙ্গি হানার সময়ও চিন একই রকম সাবধানী অবস্থান গ্রহণ করে। পুলওয়ামাতে জঙ্গি হানা এবং বালাকোটে ভারতের বিমান আক্রমণের সময়ও চিন পাকিস্তানকে সমর্থন করেনি। বালাকোটে বিমান আক্রমনেরও নিন্দা করেনি।

চিন পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেও চলতেই থাকে। ভারত আমেরিকা পারমাণবিক চুক্তির পর ভারত অনেকটা আমেরিকার কাছাকাছি চলে আসে। এই পারমাণবিক সম্পর্ক পাকিস্তানের উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে। যেন তেন প্রকারেণ পাকিস্তান চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক নির্মাণে বিশেষ উদ্যোগী হয়।

এদিকে ২০১৩ সালের পর চিন চুনার, ডোকলাম প্রভৃতি অঞ্চল এবং পূর্ব লাদাখ অঞ্চলে তার পেশী প্রদর্শনের খেলা শুরু করে এবং ভারতও ইসলামাবাদের সঙ্গে পাকিস্তানের নতুন এক জোট নির্মাণের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ২০১৯ সালে ভারত কাশ্মীরের Special Status -এর অবলুপ্তি ঘোষণার পর চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়।

এদিকে গত কয়েক বছরে পাকিস্তানের চিনের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতাও বেড়ে চলেছে। অবশ্য জঙ্গিবাদীদের পাকিস্তানের আর্থিক সহায়তা দানের ব্যাপারে মুসলিম জঙ্গিবাদীদের তৎপরতায় পাকিস্তানের মদত ও আর্থিক সাহায্য চিনকে যথেষ্ট বিব্রত করছে চিনের কাছে চিনের উইঘুর সমস্যা বিশেষ স্পর্শকাতর বিষয়। সম্প্রতি অবশ্য ইমরান খান উইঘুর সম্পর্কে চিনের অবস্থানকেই সমর্থন করেছে। যদিও বিশ্বের অন্যত্র মুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামাবাদ যথেষ্ট সক্রিয়।

২০২০ সালে চিনের সঙ্গে পাকিস্তানের এক প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং চিনের গণমুক্তি ফৌজের মধ্যে সহযোগিতার এক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান দক্ষিণ চিন সাগরে, তাইওয়ানে, তিব্বতে চিনের রাজনৈতিক সামরিক অবস্থানকে স্বীকৃতি ও সমর্থন জানিয়েছে। তাছাড়া, চিন পাকিস্তানের যৌথ সামরিক মহড়ার সংখ্যাটাও ইদানীং বেড়ে চলেছে, যা দুই দেশের মধ্যে সামরিক অংশীদারত্বের প্রমাণ।

পরিশেষে, তালিবানদের হাতে কাবুলের পতনের পর চিনের কাছে আফগানিস্তানের মাটিতে পা রাখার এক বিশেষ সুযোগ এসেছে এবং পাকিস্তানের সাহায্য ও সহযোগিতা এক্ষেত্রে চিনের কাছে বিশেষ প্রয়োজনও বটে। চিন আশা করে পাকিস্তান অবশ্যই তালিবানদের বোঝাতে চেষ্টা করবে। চিন কখনও আফগানিস্তানকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করবে না, আর্থিক সাহায্য দিয়ে তালিবানদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক নির্মাণে চিন বিশেষ উৎসাহী।

প্রসঙ্গত, বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে চিনের উত্থান, চিন পাকিস্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতের কাছে আদৌ স্বস্তিদায়ক ঘটনা নয় বলেই, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় অংশীদারদের সহযোগিতায় Indo-Pacific Strategy নির্মাণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ফকল্যান্ডের উপর আর্জেন্টিনার সার্বভৌম অধিকারের দাবিকে ব্রিটেনের মান্যতা দিতে হবে

আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির দাবাখেলায় নতুন খেলোয়াড় গণপ্রজাতন্ত্রী চিন এবার ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। ব্রিটেনের চিনা দূতাবাস থেকে ফকল্যান্ডে আর্জেন্টিনার দাবি সমর্থন করে ব্রিটেনের কাছে সওয়াল করা হয়েছে। চিন ও আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট যৌথভাবে ব্রিটেনকে বলেছেন, ফকল্যান্ডকে আর্জেন্টিনার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

চিন ব্রিটেনের উপর ফকল্যান্ডকে আর্জেন্টিনার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে।

চিনের প্রেসিডেন্ট জিন পিং এবং আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ফার্ণান্ডেজ যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, ব্রিটেনকে ফকল্যান্ডের উপর আর্জেন্টিনার সার্বভৌম অধিকার মেনে নিতে হবে। প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটেনের বিদেশ সচিব লিজ ট্রাম আর্জেন্টিনা এবং চিনের দাবিকে নস্যাৎ করে বলেছেন, এই বিষয়টিতে আলোচনার কোনও সুযোগ নেই।

প্রসঙ্গত আর্জেন্টিনা এবং চিনের মৈত্রী বন্ধন আরও উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে চিন আর্জেন্টিনার সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে।

পাকিস্তানের পর চিন দ্বিতীয়বার পারমাণবিক প্রযুক্তি রপ্তানি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

ইউক্রেন সঙ্কটের সমাধান না হলে রাশিয়ার কাছে SWIFT -এর দরজা বন্ধ হতে পারে

এতাবৎকাল আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রভাব বৃদ্ধি এবং আধিপত্য বিস্তারের জন্য সামরিক পেশী শক্তির ব্যবহারই বেশি প্রচলিত ছিল। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পেশী শক্তির বদলে আর্থিক নিষেধাজ্ঞার অর্থাৎ Sanction অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার রীতি চালু হতে চলেছে বা হয়েছে। এক কথায় অনেক ঝামেলার জন্য প্রাণে না মেরে ভাতে মারাটাই বেশি পছন্দের। সারা দুনিয়ায় মাতব্বরী করার জন্য সদা উন্মুখ আন্তর্জাতিক পুঁজির মালিক শ্রেণি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো জোটকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী শক্তিগুলি আপাতত বেশ কয়েকটি রাশিয়ান ব্যাঙ্কের সঙ্গে SWIFT (Society for worldwide Inter Bank Financial Telecomunication) এর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমেরিকা এবং ইউরোপীয়দের পক্ষ থেকে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে এই সীমিত নিষেধাজ্ঞা বা প্রতিবন্ধকগুলি রাশিয়ার অর্থনীতিকে বিশেষ আঘাত করতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া তার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য SWIFT এর মঞ্চকে ব্যবহার করে আসছে। বর্তমান সময়ে কোনও দেশের সঙ্গে Internet বা আন্তর্জালের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার মতই SWIFT এর সঙ্গে সম্পর্কবিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় আর্থিক ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতেই পারে। ইতিপূর্বে কেবলমাত্র ইরানের সঙ্গেই SWIFT এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ইরানকে ভাতে মারার এই অপকর্মের নায়ক ছিল আর কেউনয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরানের বৈদেশিক বাণিজ্য এক তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছিল। এখন পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র রাশিয়ান ব্যাঙ্কের কাছে SWIFT এর দরজা বন্ধ করা হলেও আশঙ্কা, অচিরেই রাশিয়ার সব ব্যাঙ্কের উপরই এই নিষেধাজ্ঞা চালু হতে পারে অর্থাৎ রাশিয়ার কাছে সামগ্রিকভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক এবং আর্থিক লেনদেনের জন্য SWIFT এর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। বর্তমান দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য SWIFT এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে। SWIFT এর মূল কর্মস্থল বেলজিয়াম। বেলজিয়াম ছাড়া শিল্পোন্নত কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, সুইৎজারল্যান্ড, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি SWIFT এর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

SWIFT এর মঞ্চ থেকে রাশিয়া বহিষ্কৃত হলে আর্থিক লেনদেনের জন্য টেলিফোন বা ফ্যাক্স-এর ব্যবহারের যুগে ফিরে যেতে হবে রাশিয়াকে, এবং রাশিয়ান মুদ্রার বাজারে এক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলির পক্ষ থেকে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার আশঙ্কা করেই রাশিয়া ২০১৪ সাল থেকে বৈদেশিক মুদ্রার এ সঞ্চয় বাড়িয়ে চলেছে। ২০২২-এর জানুয়ারিতে রাশিয়ার রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হল ৬৩০ বিলিয়ন ডলার। প্রসঙ্গত SWIFT এর দরজা রাশিয়ার কাছে বন্ধ করা গেলেও আখেরে তা কতদূর কার্যকর হবে বলা মুস্কিল। এমন দুর্যোগের আশঙ্কা করেই বিগত বছরগুলিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে SPFS (System for Transfer of Financial Messages) কার্যকর করার জন্য রাশিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। রাশিয়া চিনের সহযোগিতায় SPFS এর ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করতে পারে, যা আগামী দিনগুলিতে SWIFT -এর অসহযোগিতাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে। উভয়পক্ষের পুঁজিপতিদের এই লড়াইয়ের মাঝে রাশিয়ার মহাকাশ এজেন্সির মুখ্য আধিকারিক ডিমিত্রি রোগোজিন এক বিবৃতিতে বলেছেন রাশিয়ার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং আরও কয়েকটি সহযোগী দেশের মহাকাশে কর্মরত মহাকাশ যানের উপর পড়তে পারে বা ISS (International Space Station) প্রকল্প—এই মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উপরে একটি পরীক্ষাগার সমেত একমাত্র মহাকাশ যানটি মহাকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় গবেষণার কাজ করে চলেছে। এই পরীক্ষাগারটিতে এখন আমেরিকার ৪ জন, রাশিয়ার ২ জন এবং জার্মানীর ১ জন মহাকাশচারী প্রযুক্তিবিদ হিসেবে কাজ করে চলেছেন। একটি ফুটবল মাঠের আকৃতির সমান এই মহাকাশযানটি ২৮,০০০ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে চলেছে। রাশিয়ান প্রযুক্তির দ্বারা চালিত এই মহাকাশ যানটি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। এতাবৎকাল এই মহাকাশ যানটির উপর ভূ-রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েনের কোনও প্রভাব না পড়লেও রাশিয়ার মহাকাশ এজেন্সীর পক্ষ থেকে এক ছমকিতে বলা হয়েছে প্রয়োজন হলে এই অসীম গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ যানটিকে ভূপতিত করতেও রাশিয়া দ্বিধা করবে না।

সাম্রাজ্যবাদী দ্বিচারিতা এবং ইউক্রেন আক্রমণ

সুশোভন ধর

২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া রুশ সেনাবাহিনীর ইউক্রেন অভিযান এখনো অবধি থামার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে রুশ ও ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের দু'দফা আলোচনা কার্যত নিষ্ফলা থেকেছে। শত অনুরোধ-আবেদনে সাড়া না দিয়ে পুতিন এই আগ্রাসন জারি রেখেছেন। ইউক্রেনীয়রা পাল্টা প্রতিরোধ জারি রেখেছে যদিও তা পশ্চিমী অর্থবল ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ছাড়া কোনমতেই সম্ভব ছিল না। ২৩ তারিখ যুদ্ধ ঘোষণা করে পুতিন জানান যে, তাঁর লক্ষ্য ''সমরাস্ত্র ও নাজি মুক্ত ইউক্রেন''। অবশ্য এই কথা তাঁর গলায় কেন সাজে না তা আমরা আলোচনা করবো।

ইউক্রেনের পাশে সরাসরি দাঁড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। অন্যদিকে ধরি মাছ না ছুঁই পানি করেও রাশিয়াকে চিন সমর্থন করছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে চিন, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ভোটদানে বিরত ছিল। অনেকে বলছেন যে, আমরা 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ'-এর প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে। জানিনা এতটা এগিয়ে ভাবা কতটা সমীচীন হবে তবে এই আগ্রাসন অবশ্যই ঠাণ্ডা যুদ্ধের ভয়াবহ সঙ্কটের দিনগুলির কথা মনে করাচ্ছে, যেমন কোরিয়ার যুদ্ধ (১৯৫০-৫৩), কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস (১৯৬২) বা আশির দশকের মার্কিন ও সোভিয়েত মিসাইল হুমকি। এই যুদ্ধের অন্তিম পরিণতি ঠিক কি হবে বলা মুশকিল। রাশিয়া কি ইউক্রেনের পুবদিকের রুশভাষী দুই অঞ্চল— দানেৎস্ক আর লুগানস্ক দখল করেই ক্ষান্ত হবে নাকি গোটা ইউক্রেন দখল করতে চায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি শুধুমাত্র নানারকমের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সীমিত থাকবে নাকি ইউক্রেনের পুতুল সরকারকে বাঁচাতে তারা সেনা পাঠাবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে এই অভিযানের মাধ্যমে পুতিন পুরনো রুশ সাম্রাজ্যের হারানো গরিমা, যার অবসান ঘটেছিল নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে, তা ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। তিনি মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটোকে পুবদিকে আর কোন জমি ছাড়তে চান না তা, সে ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের মতামত যাই হোক না কেন।

পূর্বের কথা

এর আগে লুগানস্ক এবং দানেৎস্ক-এর (দনবাসের এক তৃতীয়াংশ) রুশ সরকার স্বীকৃত স্বাধীন অঞ্চলগুলিতে একটি ''শান্তি বাহিনী'' পাঠানো হয়েছিল যার মাধ্যমে ইউক্রেনীয় জনগণকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যে পুতিন তাঁদের মতামত ধর্তব্যের মধ্যে আনতে একেবারেই প্রস্তুত নন। গত সপ্তাহে শুরু হয় রাজধানী কিয়েভ, ওডেসা, খারকিভ এবং দেশের পশ্চিমাঞ্চল সহ বেশ কয়েকটি ইউক্রেনীয় শহরে বোমা হামলা। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, বরাবরের মতো, যুদ্ধের মূল্য দিতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে।

এই বছরের শুরু থেকেই নানা প্রশ্ন আমাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। রাশিয়া কি করতে চাইছে? তারা কেন ইউক্রেন সীমান্তে হাজার হাজার সৈন্য সমাবেশ করছে? ইউক্রেনের ওপর আক্রমণ হলে ইউরোপীয় মহাদেশ ও বাকি বিশ্বের ওপর তার কি কি প্রভাব পড়বে? এই সামগ্রিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য একটু অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ইউক্রেন এবং রাশিয়ার সরকারের মধ্যে উত্তেজনা কোনো নতুন খবর নয় এবং দুই দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমাদের শীতল যুদ্ধের শেষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে যে রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছিল তা রাশিয়া এখনও হজম করতে পারেনি। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান অবশ্যই দুটি শক্তির মধ্যে একটি সমঝোতার জন্ম দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানি তদানীন্তন সোভিয়েত কর্তা মিখাইল গর্বাচেভকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে ন্যাটো রাশিয়ার সীমান্তের দিকে প্রসারিত হবে না।

রুশ সাম্রাজ্যবাদের পুনঃজাগরণ

অতঃপর হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং চেক প্রজাতন্ত্র সামরিক জোটে যোগ দেওয়ার ফলে এই প্রতিশ্রুতি এক দশকও টেকেনি। পরবর্তীকালে, পূর্ব ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী ঢাল (anti-missile shield) বসানোর প্রচেষ্টা এবং প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির পটপরিবর্তনে, যেমন ২০০৩ সালে জর্জিয়ায় গোলাপ বিপ্লবে এবং সর্বোপরি, তার পরের বছর ইউক্রেনের অরেঞ্জ বিপ্লবে, পশ্চিমী শক্তিগুলির মদতদান ভ্লাদিমির পুতিনের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে, প্রতিবেশীদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নানা অজুহাত তার হাতে তুলে দিয়েছিল। এই হস্তক্ষেপের ক্লাইম্যাক্স ছিল ২০০৮ সালে জর্জিয়ার দুটি বিচ্ছিন্নতাকামী অঞ্চলের স্বীকৃতি এবং অবশ্যই, ২০১৪ সালে, ক্রিমিয়া দখল। ইউক্রেনের দক্ষিণে অবস্থিত এই উপদ্বীপ কৃষ্ণসাগরের অ্যাক্সেস ছাড়াও রাশিয়ার জন্য কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রাশিয়া দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চল দনবাসের বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলিকে সমর্থন জানায়। বর্তমান সামরিক আগ্রাসন অবশ্যই এক প্রহসনের সর্বশেষ অঙ্ক যার মূলে আছে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চলে আসা রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজ নিজ প্রভাবের ক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রচেষ্টা।

২০১৪ সালে ইউক্রেনীয় সৈন্য ও রুশ বিদ্রোহীদের মধ্যে লড়াইয়ের ফলে বহু রুশ ভাষাভাষী মানুষ (আনুমানিক ৯ লক্ষ) পূর্ব ইউক্রেন ছেড়ে রাশিয়ায় পলায়ন করতে বাধ্য হন। সাধারণ মানুষের এই মর্মান্তিক পরিণতি পুতিন ও তার মতাবলম্বীদের কাছে এক বড় রাজনৈতিক পুঁজি। তাঁর যুদ্ধবাজ সরকারী নীতির নৈতিক অজুহাত। পুরোনো জার আমলে ইউক্রেন নিয়ন্ত্রিত হত রাশিয়া থেকে,কৃষি উন্নত ইউক্রেনের খনিজ সমৃদ্ধ দনবাস অঞ্চলে শিল্পোন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াসে প্রচুর রাশিয়ান শ্রমিক সোভিয়েত আমলে এই অঞ্চলে আসেন। ঐতিহাসিকভাবে তাই পূর্ব ইউক্রেনে রুশ সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রভাব বিদ্যমান। পুতিনের ক্রিমিয়া দখলের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের স্বপক্ষে রুশভাষী এই বিরাট জনসম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে প্রো-ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্দোলনকারীরা যখন ২০১৪তে ইয়ানুকোভিচের বিরুদ্ধে লড়ছেন কারণ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেবার চুক্তি তিনি স্বাক্ষর করেন নি। ইউক্রেনের এক বড় অংশের সামনে তখন পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির সহায়তায় ইউক্রেনের অর্থনৈতিক উন্নতির হাতছানি। ইয়ানুকোভিচের দেশত্যাগ (পশ্চিমা মিডিয়া অবশ্য তার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বৈরাচার-এর অভিযোগ আনে) ও প্রো-ইউ আন্দোলনকারীদের সাথে রুশপন্থীদের ভয়াবহ সংঘাতে প্রচুর মানুষ মারা যান। এরই মধ্যে এই অঞ্চলে গণভোটের দাবি প্রবল হয় ও এই অঞ্চলের ৯৩-৯৭% মানুষ রাশিয়ার সাথে সংযুক্তিকরণের পক্ষে ভোট দেন। গণভোট নিয়ে পশ্চিমা রাষ্ট্র ও মিডিয়ার প্রচুর অভিযোগ কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে মার্কিন সহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলি থেকে প্রভূত অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য ইউক্রেন সরকার পেয়েছিল যা, রুশপন্থীদের সর্বাত্মক দমনে ব্যবহৃত হয়। এসবই পুতিনের হাত শক্ত করেছে।

বহু বামপন্থী এই ঘটনাগুলিকে দেখিয়ে পুতিনের পক্ষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন যা শুধুমাত্র ভ্রান্ত নয়, বিপজ্জনকও বটে। রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত পুতিনের পেছনে দাঁড়িয়েছে। ভারত সহ পৃথিবীর বহু কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থীরা পুতিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পদক্ষেপে মজে আছেন। অবশ্য বহু বামপন্থী দল ও রাজনৈতিক কর্মী পুতিনের এই আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ন্যাটোর ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছেন।

সংকটের মূল হোতা

বর্তমান সঙ্কটের তিন প্রধান পাণ্ডা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউক্রেন। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো ব্লক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ১৯৪৫ সালের পর পৃথিবীতে প্রায় সমস্ত আগ্রাসন, যুদ্ধ এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী। ন্যাটো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ব্লক যা গত বিশ বছর বা তারও বেশি সময়ে সরাসরি তিনটি বড় ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছিল আফগানিস্তান (২০০১), ইরাক (২০০৩) ও লিবিয়ায় (২০১১)। আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও অন্যান্য বহু জায়গায়। তারা ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব নিয়ে নীতিকথা শোনাতে ব্যস্ত, কিন্তু পাকিস্তানে হাজার হাজার নাগরিককে হত্যা করার জন্য ড্রোন ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে নি। তুরস্কের এরদোগানের সরকার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে উত্তর সিরিয়া আক্রমণ করে সমস্ত অঞ্চল দখল করলে ন্যাটো তার সেই কাজে মদত দেয় কারণ তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য এবং পশ্চিমী ব্লকের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। ইসলামি থিওক্রেসি ও অগণতান্ত্রিকতার পীঠস্থান সৌদি আরব ন্যাটোর ঘনিষ্ঠ সামরিক মিত্র। তাই সৌদি রাজপরিবার ইয়েমেনের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে পার পেয়ে গেছিল। ন্যাটো পুতিনের সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে থামানোর জন্য এই মুহূর্তে উদগ্রীব কিন্তু নিজেরা ১৯৯১ এর পরবর্তী সময়ে পূর্ব ইউরোপকে গিলে খেয়েছে এবং ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের একটি ঘাঁটিতে পরিণত করতে চেষ্টার কোনও কসুর করেনি।

এই সংঘাতের অন্যপক্ষ, রাশিয়ার পুতিন-রাজ আসলে একটি বোনাপার্টিস্ট গোষ্ঠী (আলিগার্কি) শাসন। মাফিয়ার মতো কিছু গোষ্ঠী আজ রাশিয়াকে চালায় যারা ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে গ্যাংস্টারদের কায়দায় পরিকল্পিত সোভিয়েত অর্থনীতির ধ্বংসসাধন ও লুঠপাট চালিয়ে নিজেদের পকেট ভরেছে। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান এমন এক তলানিতে ঠেকেছে যা তিন দশক আগে রুশদেশে দুঃস্বপ্নেও ভাবা যেত না। কতিপয় বিলিয়নেয়ারের মৃগয়াভূমি আজকের রাশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে অসম সমাজ, যেখানে বড়লোক আর গরীবের মধ্যে আয় এবং সম্পদের বৈষম্য চরমতম। এছাড়া রাশিয়ায় কারাবাসের হার, আত্মহত্যার হার এবং খুনের হার রেকর্ডছোঁয়া।

একদিকে যখন কয়েক লক্ষ শিশু রাস্তায় রাস্তায় গৃহহীন জীবনযাপন করে, তখন পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি, পুতিন, একটি এক বিলিয়ন ইউরোরও বেশি দামী মার্বেল এবং সোনার মোড়নো নতুন প্রাসাদে বাস করেন। এই বিলিয়নেয়ার একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হল উগ্র-জাতীয়তাবাদ, অর্থোডক্স চার্চের প্রতি ধর্মীয় সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা, এবং নারী ও সমকামীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা সহ প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-আধুনিকতা বিরোধিতার মিশ্রণ। পুতিন বলশেভিকদের শয়তান বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং শেষ জারের প্রতি সম্মান জানিয়ে গির্জায় হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসেছিলেন। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে, পুতিন পিনোচেতের শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে পুঁজিবাদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক হিংসা ভাল এবং সঠিক ও পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার জন্য যে কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ খারাপ এবং পাপদুষ্ট।

যেহেতু পরম শক্তিশালী এবং সামগ্রিকভাবে বহুগুণ আক্রমণাত্মক ন্যাটোর তুলনায় রাশিয়া অনেক দুর্বল পক্ষ সেহেতু এই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতায় তারা বেশ পিছিয়ে পড়েছে যার পরিণতিতে রুশ প্রভাবাধীন ক্ষেত্রগুলি ১৯৯১ থেকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। পুরনো সম্মান পুনরুদ্ধার করতে তার প্রয়োজন কিছু সীমিত ও ছোট সাফল্য যেমন চেচনিয়া দখল, ন্যাটো ব্লকে যোগদানকারী জর্জিয়ার কিছু মাথাকে ধরে রাখা, ন্যাটোর দিকে ঝুঁকে থাকা দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ইউক্রেনে নিজের প্রভাব বিস্তার এবং আসাদকে সমর্থনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে অন্তত একটি আউটপোস্ট ধরে রাখা ইত্যাদি। এই সংকটে, পুতিন সম্ভবত যুদ্ধের হুমকি দিয়ে ন্যাটো ব্লকের সাথে ইউক্রেনের সম্পর্ক শিথিল করতে চেয়েছিলেন। যখন তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় এবং মার্কিনীরা স্পষ্টতই রাশিয়াকে সামান্যতম প্রতীকী ছাড়গুলিও দিতে অস্বীকার করে, তখন পুতিন বেপরোয়া হয়ে ইউক্রেন দখল করতে নগ্ন সামরিক শক্তি ব্যবহার করার পথ বেছে নেন। এই উগ্র-জাতীয়তাবাদী আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য স্বদেশে তার বোনাপার্টিস্ট শাসনের জনপ্রিয়তা এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা।

এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে বিশ্ববাজারে তেলের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ব্রেন্ট ক্রুডের মূল্য ব্যারেল প্রতি ১০৬ ডলার যা একবছর আগেও ছিল এর অর্ধেক। ২০১৪ সালের পূর্বতন সঙ্কটের পরে তেলের দাম এই পরিমাণ বাড়ে নি। যুদ্ধ আরও কিছুদিন চললে এই মূল্য ১৫০ ডলারও পার করে যেতে পারে। এছাড়া গোটা ইউরোপ রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। এই মুহূর্তে গ্যাসের দাম মেগাওয়াট আওয়ায় প্রতি ১৪২ ইউরো ছুঁয়েছে, যা একবছর আগে ছিল ১৬ ইউরো। ঠিক এই মূল্যবৃদ্ধির ওপর পুতিন বাজি ধরেছেন। তিনি জানেন যে যুদ্ধ এবং রাশিয়ার ওপর নানারকমের নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ধরাছোঁয়ার

এর পর ৬ পাতায়

‘উন্নয়নের’ কয়লাখনি

নতুন কথায় পুরনো ধোঁকা

উন্নয়ন-এর মানে কি? উন্নয়নের মানে যদি হয় শিল্পের নামে সাধারণ মানুষকে, খনি বা বড় বাঁধ তৈরি করতে আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ আর পরিবেশ দূষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনের সহায়তা করা, তবে সেই উন্নয়ন আমরা চাই না। আর বস্তিবাসী বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে, জলাভূমি বুজিয়ে শহরে বড় বড় বহুতল, শপিং মল নির্মাণ, গাছ কেটে, নয়নজুলি বুজিয়ে রাস্তা চওড়া বা ফ্লাইওভার তৈরি যদি বিকাশের সংজ্ঞা হয়, তবে সেই বিকাশের আমরা বিরোধী। আমাদের কাছে উন্নয়নের মানে প্রান্তিকতম মানুষের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর বাসস্থান। বর্তমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর থেকে আসলে লাভবান হয় পুঁজিপতিরা।

ডেউচা-পাচামিও তার ব্যতিক্রম নয়। বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লকের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১টি মৌজার প্রায় ১১.২২২ একর জমি যা প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দেওয়ানগঞ্জ-হরিণশিঙ্গা আর ডেউচা-পাচামি কয়লা ব্লক। যার মজুত পরিমাণ বলা হচ্ছে প্রায় ২০২৫ মিলিয়ন টন। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ৩৫,০০০ কোটি টাকা আর পুনর্বাসনের জন্য আরও ১০,০০০ কোটি টাকা। যদিও, জিওলজিক্যাল সার্ভের এক রিপোর্ট অনুযায়ী জমি লাগবে আরো বেশি। ‘Large area needed outside block area, for external dumps as well as for access trench.’

সংবাদে প্রকাশ ডেউচা-পাচামির এই প্রকল্প হলে ২১,০০০ চাইতেও বেশি মানুষ উচ্ছেদ হবেন, যাদের মধ্যে ৯, ০৩৪ জন আদিবাসী আর ৩,৬০১ জন দলিত সম্প্রদায়ের। সংখ্যালঘু সহ অন্য মানুষেরাও আছেন। ৪,৩১৪টি বাড়ি ভাঙা পড়বে। সান্তালদের জীবনচর্যা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি আর ধর্মাচারণ শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মতো নয়। তাদের একটা যৌথ লোকজীবন আছে। ধ্বংস হবে তাদের লোকজীবনের অন্যতম অংশ মাঝি থান আর জোহার থান। এই অঞ্চলেই আছে মৌবেলিয়া রিজার্ভ ফরেস্ট।

ইতিমধ্যেই বীরভূমের এই অঞ্চল পাথর খাদানের দূষণে দূষিত। পাথর খাদান তাঁদের জীবনে কোনো আর্থিক উন্নতি ঘটায়নি। উপরন্তু ক্ষতি করেছে তাঁদের চাষবাস। তাঁদের সংস্কৃতি। তাঁদের স্বাস্থ্য। পাথর খাদানের শ্রমিকরা সিলিকোসিসের মারণ রোগে আক্রান্ত হন। খনিজ ছাড় সুবিধা আইন, ১৯৬০ এবং খনিজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আইন ১৯৮৮-র ২০০৩ সালের সংশোধনী অনুসারে খাদান বুজিয়ে ফেলা সংক্রান্ত বিধি বনাধিকার আইন ২০০৬ বা ২০১৩ সালের আইনানুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন এখনও পর্যন্ত ডেউচা-পাচামিতে মানা বা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। খনন-উত্তর জমি, জলের মান উন্নয়ন, বায়ুর মান উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকার উপরিভাগ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশিকা আদৌ পালন করা হয়নি। এখানে আছে অতি গভীর পাথর খাদান। বর্জ্য ও ধুলোর ফলে রাস্তার উপর দু-চার ইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ। ক্ষতি করে চলেছে মানুষের শরীর আর প্রকৃতির। ‘এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্লক’ থেকে কয়লা উত্তোলনে রাজ্য সরকার জোর করে, যেনতেন প্রকারে তা করতে সচেষ্ট।

প্রথমে ইস্টার্ন কোলফিল্ডকে কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব দেওয়া হলেও, এই প্রকল্প লাভজনক নয় বলে তারা কোনো উদ্যোগ নেয় না। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালে পশ্চিমবাংলা রাজ্য সরকার এই দায়িত্ব WBPDCL কে দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ৯ মার্চ, ২০১১ সালে সংসদে প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন কয়লা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন এই প্রকল্প লাভজনক নয় বলে কোল ইন্ডিয়া এতে থাকবে না।

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, ডেউচা-পাচামিতে কয়লার স্তর রয়েছে ব্যাসল্ট পাথর বা আগ্নেয় শিলার অনেক নিচে। এটি প্রায় ২২৫ থেকে ২৪৫ মিটার পুরু পাথরের স্তর কেটে এবং তা তুলে ফেলে তার নিচে থেকে কয়লা উত্তোলন বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যাসাল্ট পাথরের ঠিক উপরে রয়েছে টপ সয়েল, যাকে আমরা মাটি বলি। ব্যাসাল্ট পাথরের নীচে চারটি স্তরে কয়লা আছে। আবার কয়লার স্তরগুলির মধ্যে আছে পাথরের স্তর।

খোলামুখ কয়লা খনির যে গল্প বলা হচ্ছে তা এককথায় অবাস্তব। এখানে কয়লা উত্তোলন হবে ব্যয় বহুল। সস্তায় বিদ্যুৎ দেওয়াটা আসলে ভাঁওতা। বিদ্যুৎ নিগমের খনিগুলির হাতে আগামী ৩০ বছরের জন্য পর্যাপ্ত কয়লা আছে। ব্যাসাল্টের জন্য বোর হোল ড্রিল খুবই ব্যয়বহুল। তাছাড়া এই ধরনের ব্লাস্টিং-এ বারুদের মাত্রা, শব্দ, গ্যাস সবটাই মাত্রাহীন। ফলে, আশপাশের বাড়ি-ঘরের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। ভূগর্ভস্থ জলের কি অবস্থা হবে?

খোলা মুখ কয়লা খনির অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের খোট্টাডিহি ও সোনপুর বাজারি খোলামুখ কয়লা খনির উপর ২০১৫ সালের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে বাতাসে SPM (বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ)-এর মাত্রা যথাক্রমে ২৬৭.৪ ও ২৭৪.৯১ যা, নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় অনেক বেশি।

পিপলস কালেকটিভ ইন্ডিয়া একটি সমীক্ষা চালায় ঝাড়খন্ডের রামগড় জেলার প্রত্যন্ত চারটি গ্রামে, যা সেন্ট্রাল কোলফিল্ড এবং টাটা ষ্টীলের খোলামুখ কোলিয়ারি ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে। ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা চিকিৎসক ও গবেষকদের দল ২৩৫৩ জনের উপর সমীক্ষা করেন। তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে এখানের মানুষের প্রধান দশটি রোগের কথা। যথা—ব্রঙ্কাইটিস (হাঁপানি সহ); নিশ্বাসের সমস্যা; যক্ষ্মা, ত্বকের ; চুল উঠে যাওয়া; চোখের রোগ, পা/পায়ের পাতাফাটা ও ঘা; কোমরে ব্যথা, বাত এবং পেটের অসুখ। এই এলাকার বায়ু, জল, মাটি পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে মারাত্মক দূষণ। বায়ু দূষণ (পিএম ২.৫) যা ভারতীয়; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও মার্কিন নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার সীমা অতিক্রম করেছে। বাতাসে যে পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল ও সিলিকন পাওয়া গেছে স্বাস্থ্য নির্দেশিকার নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত। মাটিতে যে পরিমাণ ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম পাওয়া গেছে, তা পরিবেশ রক্ষায় নির্দেশিত মাত্রা অতিক্রম করেছে। বিষাক্ত ক্রোমিয়াম ও নিকেল পাওয়া গেছে পলিতে, ফলে জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব সংকটে। অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া গেছে জলে, যা ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। গোটা আসানসোল-রানিগঞ্জ কয়লাঞ্চলের, তা খোলামুখ বা মাটির নীচে খননের ফলে পরিবেশ দূষিত, ধ্বস, গ্যাস ও আগুনপ্রবণ।

খোলামুখের ভয়ঙ্কর বিপদ

ডেউচা-পাচামি অঞ্চলে খোলামুখ কয়লা খনি তৈরি হলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বীরভূমের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে মারাত্মক। লক্ষ লক্ষ বছরে সৃষ্টি হওয়া টপ সয়েল চিরতরে হারিয়ে বর্জ্য পাহাড়ে পরিণত হবে। মরুভূমিতে পরিণত হবে। জমির উর্বরতা ধ্বংস হবে। খোলামুখ কয়লা খনি হলে কয়েকশ মিটার নীচের মাটি উপরে চলে আসবে আর উপরের মাটি নীচে চলে যাবে। এই অঞ্চল বন্ধ্যা হয়ে যাবে। শুধু ধ্বস নয়, এর ফলে স্থলজ ও জলজ জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হবে ব্যাপক। বর্ষার সময়ে সেই মাটির স্তূপ ধুয়ে গিয়ে ভরাট হবে ঐ অঞ্চলের নদনদীর তলদেশ, ডেকে আনে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যা। ঐ মাটির স্তূপ থেকে ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহের ব্যাঘাত ঘটিয়ে শুধু ওই এলাকার নয়, এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিজ-বনজ উৎপাদন ও নদী -পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করবে। এলাকার প্রাকৃতিক ভূ-গর্ভস্থ জলের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। খোলামুখ কয়লাখনি থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে কুয়ো, টিউবওয়েলের জল শুকিয়ে যাবে, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক জলস্তরের পরিবর্তন ঘটবে। জামুরিয়াসহ আসানসোল-রানিগঞ্জ অঞ্চলে যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি, যা বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম মুখ্য কারণ। শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে কার্বন নিঃসরণের ৮০ শতাংশ উৎস হল কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এর ফলে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের বাইরে থাকা ওজোনস্তরে ছিদ্র তৈরি করে। এই ছিদ্র দিয়ে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি, অতি বেগুনি রশ্মি ও তাপ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে বাড়াচ্ছে, গলছে মেরু অঞ্চলের বরফের টুপি আর বিভিন্ন পর্বতমালায় সঞ্চিত বরফ। ফলে, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে ২০৩০ সালে সুন্দরবন আর কলকাতা শহরের একাংশ সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে জলের তলায় চলে যাবে।

সম্প্রতি গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত COP 26 এ দাবি উঠেছে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে শূন্যতে আনতে হবে। সারা বিশ্বে আওয়াজ উঠছে জীবাশ্ম জ্বালানির বিরুদ্ধে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গ্লাসগোতে বলেছেন, ২০৭০ -এর মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্য করবেন। এই রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের কোনো ঘাটতি নেই। অনেক ক্ষেত্রে এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও বিদ্যুত রপ্তানি করা হচ্ছে। আগামী ৩০ বছরের জন্য পর্যাপ্ত কয়লা মজুত থাকা সত্ত্বেও, নতুন করে কয়লাখনি কাদের স্বার্থে?

সম্প্রতি C40-এর এক গবেষণায় প্রকাশ কয়লাজনিত বায়ুদূষণের হার ৬১টি মেগাসিটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কলকাতায়। কলকাতার চারপাশে রয়েছে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কয়লাজনিত বায়ুদূষণের ফলে হাঁপানি সহ অন্যান্য শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মৃত্যুতে শীর্ষে কলকাতা।

যারা বলছেন ডেউচা-পাচামিতে কয়লাখনি তৈরি হলে নাকি এই রাজ্যে শিল্পের বান ডাকবে, তাদের কাছে প্রশ্ন সাম্প্রতিক সময়ে এ-পর্যন্ত ক'টা শিল্পোদ্যোগ গড়েউঠেছে এ-রাজ্যে? আসল উদ্দেশ্য জমির টপ সয়েল নষ্ট করে ব্যাসাল্ট পাথরের ব্যবসা করা। যার ফলে একদিকে মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা হারাবে, পরিবেশ ধ্বংস হবে আর অন্যদিকে চলবে লুঠের ভাগ-বাঁটোয়ারা। আর পুনর্বাসন প্যাকেজ নিয়ে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি।

জঙ্গলের উপর এবং হাজার হাজার বছর ধরে চাষআবাদের উপর জীবিকা নির্ভরশীল এই অঞ্চলের মানুষদের জন্য নাকি ‘বিশেষ’ ও ‘সেরা’ প্যাকেজের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই প্যাকেজে বলা হয়েছে, যাদের জমি আছে তারা বিঘা প্রতি পাবে ১০-১৩ লক্ষ টাকা, ৫.৫ লক্ষ টাকা পাবে স্থানান্তরের জন্য এবং ৬০০ স্কোয়ার ফুট ঘর পুনর্বাসন কলোনিতে। এছাড়াও, জমিহারা প্রতি পরিবারের একজন রাজ্য পুলিশের জুনিয়র কনস্টেবল পদে চাকুরি পাবে। এই সংখ্যাটি ১০,০০০ টাকা করে পাবে এক বছরের জন্য। আর ১৬০ জন কৃষি শ্রমিক এককালীন ৫০,০০০ টাকা আর নারেগা প্রকল্পে মোট ৫০০ দিনের কাজ পাবে। এছাড়া বলা হয়েছে সরকারি খাস জমিতে প্রথমে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

এই অঞ্চলে তিন ধরনের জমি আছে, সরকারি খাস জমি, রায়তি জমি আর ফরেস্ট ল্যান্ড। বহু মানুষ সরকারি খাস জমিতে বসবাস, চাষাবাদ করে, তাদের কথা প্যাকেজে আদৌ উল্লেখ নেই।

● ১০-১৩ লক্ষ টাকায় কতদিন চলবে? ন্যূনতম পাঁচজনের পরিবার হলে, পরিবারের একজন চাকুরি পেলে, বাকিরা কোথায় যাবে। তাদের জীবিকা চাষ আবাদ তো নষ্ট হয়ে যাবে।

● জঙ্গলের সাথে আদিবাসী জীবন সম্পৃক্ত। ৬০০ স্কোয়ার ফুটের ঘর, তাদের বসবাসের অযোগ্য।

● আদিবাসীরা বাস্তুচ্যুত হলে তাদের সংস্কৃতি, লোকজীবন, কৃষ্টি, ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের সংস্কৃতি, ধর্মের অঙ্গ তা হারিয়ে যাবে। ঐ অঞ্চলের মন্দির, মসজিদ, গির্জা আর কবরস্থান, হাসপাতালের কি হবে?

● এই প্যাকেজে ভাগ ভূমিহীন কৃষক, ভাগচাষী, বর্গাদার, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ীদের বিষয়ে কোন কিছুরই উল্লেখ নেই। তাদের জীবিকার কি হবে? তারা কি তাদের জীবনধারার পূর্বের বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি বজায় রাখতে পারবে?

● আদিবাসী জনজাতির সম্মিলিত পশুচারণ ভূমির কি হবে?

● এটা হাস্যকর যে প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই অঞ্চলে নাকি ১৬০ জন কৃষিক শ্রমিক।

● ক্র্যাশারের শ্রমিকদের ৫০,০০০ টাকা এককালীন আর ১০,০০০ টাকা এক বছরের জন্য দিলে তাদের সারা জীবন কিভাবে চলবে?

দেউচা-পাচামিতে কয়লা উত্তোলন হবে মূলত খোলামুখ কয়লা খনির মাধ্যমে। এই ধরনের উত্তোলন যন্ত্র নির্ভর, ফলে প্রয়োজন স্বল্পসংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের। তাছাড়া এই ব্যাপারে বরাত মূলত পাবে বেসরকারি সংস্থা। বেসরকারি সংস্থা স্থানীয় বাসিন্দাদের এই কাজে নিয়োগ করবে না। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় নেই। সরকার সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চাকুরি আদৌ হবে না।

তাই, আমাদের দাবি—

১. অবিলম্বে দেউচা-পাচামি বা দেওয়ানগঞ্জ-হরিণশিঙ্গার প্রস্তাবিত কয়লাখনি বাতিল করতে হবে। প্রস্তাবিত কয়লাখনি অঞ্চলে কোনো উচ্ছেদ চলবে না।

২. আর নয় জীবাশ্ম জ্বালানি। আর নয় কয়লা। আর খোলা মুখ হোক বা বন্ধমুখ পরিবেশ দূষণকারী কয়লাখনি চাই না।

৩। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করো, হুমকি বন্ধ করো।

৪. বর্তমানে চালু খনি খাদান নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে বন্ধ করার প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করতে হবে, এই শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে।

৫. গ্রীন এনার্জি ব্যবহারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আসুন, আমরা মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী জ্বালানি জীবাশ্মের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই। দেউচা-পাচামিতে পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা ধ্বংসকারী প্রস্তাবিত খোলামুখ কয়লাখনির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এ সামিল হই।

সৌজন্যে : প্রজেক্ট অ্যাফেক্টেড পিউপলস্ Project Affected Peoples Association

এই মুহূর্তে ভারতের মেয়েদের অবস্থান

যশোধরা রায়চৌধুরী

২০২১। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা। দেশের এক বড় অংশের মেয়েরা জানালেন, স্বামীর দ্বারা প্রহৃত হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। আপত্তিরও না। যথাযথ কিছু কারণে বাড়ির পুরুষটি ''পরিবারের'' ওপরে হাত তুলতেই পারে। যথাযথ কারণগুলো সাতরকমের। তার মধ্যে এক প্রান্তে পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবার মতো কারণ যেমন আছে, অন্য প্রান্তে আছে খারাপ রান্না করাও!

এ কী গো বিস্ময়! সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ। 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়ায়', মেয়েদের কাছে স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া কোনো বিস্ময় নয়, বিচলিত হবার বা আপত্তি করার মতো বিষয়ও নয়। হঠাৎ মনে পড়ে, এক অতি আপত্তিকর উক্তি, সেই কোন শৈশবে শুনেছিলাম। সেইসময় থেকেই যা আমাদের কাছে সর্বদা পরিত্যাজ্য। কথাটা কি? মনুর বিধান হল, ''নারী শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও প্রৌঢ়ত্বে পুত্রের অধীনা।'' আজও ভারত এই বিধানকে মর্মে মেনে নিয়েছে। আর কি বলে দিতে হবে, এই দেশের নারীর অবস্থা ও অবস্থান?

এ তালিকায় সর্বোচ্চ স্থানে তেলেঙ্গানা। সে রাজ্যের ৮৩.৮ শতাংশ মহিলা বউপেটানোর সপক্ষে। তেমনই পুরুষদের মধ্যে সবার আগে কর্নাটক। সেই দক্ষিণী রাজ্যের ৮১.৯ শতাংশ পুরুষ মনে করেন, স্বামী যদি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন, তাতে কোনও দোষ নেই! হিমাচলে আবার পুরুষ নারী নির্বিশেষেই এসব বিশ্বাস করেন খুব কম শতাংশ মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ? ৪২ শতাংশ মেয়ে পিটুনিতে রাজি! পিটুনির সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে কি? পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে, শ্বশুরকুলে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাটাই স্বামীর হাতে স্ত্রীর মার খাওয়ার যথেষ্ট যুক্তি। অন্য এক এক রাজ্যে এই কারণের পাল্লা এক একদিকে ভারি। কেউ ভাবছেন, পরকিয়ার সন্দেহে স্ত্রীকে মারা বৈধ, কেউ ভাবছেন, ভাল রান্না না করার জন্য মারাই যায় বউকে...সংসার আর সন্তানের যথোপযুক্ত দেখভাল না করাওটা বড় কারণ।

গত দুশো বছর ধরে নবজাগরণ, রামমোহন বিদ্যাসাগর, আইন গড়া, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, আশাপূর্ণা... সাহিত্যের ভাঁজে ভাঁজে মেয়েদের প্রতি অবিচার নিয়ে এত কথা। ভারতীয় সমাজ যে দুশো বছরে অপরিবর্তিত আছে তা অতিবড় মূর্খেও বলবে না। তথাপি কিছু বদ্ধ কাঠামো, তলদেশে চাড়ানো শিকড়ে কোনো পরিবর্তন হয় নি কি তবে। দেশ স্বাধীন হবার ৭৫ বছর পরও, আমাদের সমাজের মূলগত কাঠামোটি এতটুকুও বদলাবে না?

হ্যাঁ অবশ্যই মেয়েদের আপাতদৃষ্টিতে প্রচুর বদল। তাদের পোশাক, তাদের হাতের ফোন, তাদের ঘরের শোভা সবই সমসময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে। তাদের ভেতরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, ভাল খাওয়া ভাল পরার দাবি আছে, আছে নতুন নতুন গ্যাজেটের জন্য চাহিদা, বাচ্চাকে বড় ইশকুলে পাঠানোর ইচ্ছা। কিন্তু হ্যাঁ। এখনো তিনি সহবাসের ব্যাপারে মুখে রা কাড়েন না। অসহ্য হলেও সয়ে যান। কারণ সমাজ তাঁকে শিখিয়েছে মুখ বুজে থাকতে। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে।

২

এ যদি হয় মুদ্রার একটি দিক, তবে অন্য দিকটি কি? গৃহের লক্ষ্মী বা গৃহবধূরা যেমন হেনস্থার শিকার, তেমন যেসব নারীরা আরো অরক্ষিত, আরো বেশি বেশি করে সমাজের প্রান্তবাসী, সেই যৌনকর্মী বা বেশ্যাদের জীবনটা কেমন?

তাঁদেরও দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে পড়ে হেনস্থা। কেননা তাঁরাও থাকেন কোনো পার্টনারের সঙ্গে, সেই পার্টনার বা দাম্পত্য সম্পর্কের পুরুষসঙ্গী তাঁকে দিয়ে ব্যবসা করান, এবং নিজেও ভোগ করেন তাঁকে।

ভারতে, মেয়েদের ওপরে অত্যাচার, বিশেষত গার্হস্থ্য অত্যাচার নিজেই একটি জ্বলন্ত বিষয়। তথাপি ট্যাবু বিষয়। খুব কম আলোচিত বিষয়। নীরবতার নীল নির্জন জলাশয়ে মুখ ডুবিয়ে থাকা ডুবোপাহাড়। যতটা ওপরে থাকে, তার থেকে বেশিটাই নীরবতা বা নৈঃশব্দ্যের শীতলতায়, নিচের তলায়। দেখাই যায় না তাকে। তাহলে আর যৌনকর্মী মেয়েদের কথা আলাদাভাবে আলোচিত হবে কীভাবে।

সমাজের মানসিকতার ক্ষেত্রে এটা সত্যি হলেও, বস্তুত যে কোনো শহর-কারিগর বা শহর-প্রশাসকের কাছে যৌনকর্মীদের অবস্থা ও অবস্থান খুব গুরুত্বের। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো দেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও।

এইচ আই ভি/এইডস এর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে পতিতালয়ের যোগটা প্রতিষ্ঠিত। আর যে যে ক্ষেত্রে যৌনকর্মীরা হিংসার মুখোমুখি, তাঁদের অক্ষমতা ও অনিরাপত্তা বেড়ে যাচ্ছে, পুরুষসঙ্গীকে কন্ডম ব্যবহার করতে বলতে পারছেন না, জোর করে সঙ্গম করা হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে, এইসব অসুখ দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আটকানোও সম্ভব হবে না। আর সেকারণেই এটা পাবলিক হেলথ বা জনস্বাস্থ্যের একটা বৃহৎ প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়াবে।

এছাড়া তো যৌনকর্মীদের ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রশ্ন আছেই।

চেন্নাইয়ের সুভদ্রা পঞ্চনাদেশ্বরম, সেতুলক্ষ্মী জনসন প্রমুখের করা একটি স্টাডি নির্যাতিত নারী যৌনকর্মীদের (FSWs) প্রোফাইল তৈরি করেছে। ১০০ জন যৌনকর্মীর সাক্ষাৎকারে ৯৮ জনই ঘনিষ্ঠতম পার্টনার বা ''ক্লায়েন্ট''র দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ পার্টনার অর্থাৎ 'নিয়মিত' ক্লায়েন্টদের সাথে সম্পর্ক থেকে শুরু করে মানসিক সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তা যাদের থেকে এঁরা পান। পুলিশ, পিম্প এবং টাকা দেয় যে (মালিক বা তার সহকারী)—হিংসা আসতে পারে এই সব ক্ষেত্র থেকেই।

স্টাডির এই মেয়েদের ৬২ শতাংশ এর বয়স ২০ থেকে ৪০-এর ভেতরে। ৯৮ শতাংশের অভিজ্ঞতা কী? মৌখিক হিংসা, মানে গালাগালি... তারপর ''মাইনর'' আঘাত অর্থাৎ চড় থাপ্পড়, ঠেলা-ধাক্কা...৯২ শতাংশ ক্ষেত্রে সজোরে আঘাত, ঘুঁষি বা কোনো জিনিস দিয়ে আঘাত...৯৭ শতাংশ লাথি বা হিঁচড়ে টেনে নেওয়া....৬২ শতাংশ ক্ষেত্রে গলা টিপে বা পুড়িয়ে মারার চেষ্টা। ৩২ শতাংশ কোনো না কোনো অস্ত্র, যথা ছুরি বা বন্দুকের সামনে পড়েছেন।

চেন্নাইয়ের এই স্টাডি দেখাচ্ছে, হিংসার কারণ সাধারণত পার্টনারের নেশাগ্রস্ততা (৮১ শতাংশ), ''আদৌ কোনো কারণ ছাড়া'' আক্রমণ (৬৯ শতাংশ), নয়ত বিশ্বাসভঙ্গের সন্দেহ (অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের সন্দেহ) ৮০ শতাংশ। আরো কিছু কারণ হতে পারে যৌন সম্পর্ক করতে অস্বীকার, বা মুখে মুখে উত্তর দেওয়াও।

বেঙ্গালুরুর প্রকাশ জাভালকর লুসি প্লাট প্রমুখের করা এক স্টাডিতে ছশো যৌনকর্মীর ওপর স্টাডি করা হয় ও দেখা যায়, এঁদের একটা বড় অংশ দেবদাসী প্রথার সঙ্গে যুক্ত। অনেকেরই সন্তান আছে। এঁদের সঙ্গে অনিরাপদ যৌন সম্পর্কে বাধ্য হচ্ছেন বেশিরভাগ মেয়ে এবং এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে এইচ আই ভি সংক্রমণের। ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে শারীরিক ও যৌন হিংসা দুইই এঁদের অভিজ্ঞতায় আসছে।

এই সমীক্ষা অনুসারে ভারতে আনুমানিক আট লক্ষ আটষট্টি হাজার মহিলা রয়েছেন যাঁরা বর্তমানে যৌন কাজে নিযুক্ত। কর্ণাটকের জন্য আনুমানিক সংখ্যাটা দাঁড়ায় এক লক্ষের কাছাকাছি। যৌন কাজ, বর্ণবৈষম্য, দারিদ্র্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যা ভারতের বেশিরভাগ অংশে বিস্তৃত। কর্ণাটকের উত্তর অংশে 'দেবদাসী' প্রথা তো আছেই, আর আছে ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে কম বয়সে বিবাহ এবং অল্পবয়সী মেয়েদের যৌন কাজে নিবেদিত করার চল। যদিও, দেবদাসী প্রথাটি ১৯৮৮ সালে অবৈধ ঘোষিত হয়, তবু এখনও উত্তর কর্ণাটকের ঐতিহ্য এটাই। উত্তর কর্ণাটকের যৌনকর্মীদের ৯০ শতাংশেরও বেশি দেবদাসী পরিবার থেকে আসে এবং এঁরা সবচেয়ে প্রান্তিক 'তফসিলি' জাতি বা উপজাতিরও বটে।

এইসব স্টাডি থেকে উঠে আসে জনস্বাস্থ্য হস্তক্ষেপের নানা চিন্তা আর আয়োজন। অনেকগুলো জরুরি পরিষেবাকে একত্রে প্রয়োগ করার জরুরি প্রয়োজন বোঝা যায়। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কজনিত হিংসা থেকেই যেহেতু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এই মেয়েরা, নারীর প্রতি হিংসা একটা ব্যাপক সামাজিক সমস্যা। সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী তথ্য বলে, শারীরিক এবং/অথবা যৌন হিংসা আসে অন্তরঙ্গ সঙ্গীর থেকেই ১৫ শতাংশ থেকে ৭১ শতাংশ ক্ষেত্রে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য মেয়েদের আরো দুর্বল করে রেখেছে। ভারতের ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (NFHS 3) থেকে সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা গেছে যে ৩৫.৫ শতাংশ বিবাহিত নারী তাদের স্বামীর যৌন হিংসার শিকার।

৩

দ্য হিন্দু পত্রিকা, ২২ জুন, ২০২০ একটি খবর ছাপে, যে ভারতে গৃহহিংসার ঘটনা লকডাউনের সময়ে গত দশ বছরের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশের কাছে জমা হওয়া গৃহহিংসার ঘটনার নিরিখে এই খবর। কিন্তু সংবাদদাতা এও মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, ভারতে ৮৬ শতাংশ গার্হস্থ্য হিংসার কেসই আসলে পুলিশ বা প্রশাসন বা মহিলা কমিশন, কারোর কাছেই যায় না। রিপোর্টেড হয় না, কারণ নীরবতার এক নীল নিস্তব্ধ পুকুরের ভেতর মেয়েদের ডুবিয়ে রাখা হয়েছে অনন্তকাল ধরে, যুগ যুগ ধরে। নিজের অক্ষমতা, ভবিতব্য, বা শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের স্বাভাবিক প্রাপ্য বলেই গৃহহিংসাকে ধরে নিতে শিখেছেন মেয়েরা, ভারতের পুণ্যভূমিতে।

২০২০র লকডাউনের পরেও অনেক পুরুষ চাকরি ফিরে পান নি। ভারতের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেকগুলো রিপোর্ট ইতিমধ্যেই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, যে গত এক দেড় বছরে, মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে আমাদের। আই ডি আর পত্রিকার বিক্রম প্যাটেল ও মধুমিতা বালাজি জানাচ্ছেন, ভারত সরকারের মেন্টাল হেলথ সার্ভে থেকেই আমরা জানছি ভারতের দশ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক মানুষ অ্যাংজাইটি বা মুড সুইং থেকে শুরু করে আরো গুরুতর অন্যান্য মানসিক অসুখ নিয়ে বাঁচেন। গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ স্টাডি বলছে ভারতের কুড়ি কোটি মানুষ ডিপ্রেশন থেকে আরম্ভ করে আরো নানা মানসিক রোগের শিকার। সারা পৃথিবীতে যত মেয়ে আত্মহত্যা করেন, তার এক তৃতীয়াংশ ভারতীয় মেয়ে। সারা পৃথিবীর আত্মহত্যাকারী পুরুষের এক চতুর্থাংশ ভারতীয়। স্পষ্টত এ বড় সুখের সময় নয়। মার্চ থেকে মে ২০২০-র ভেতরে ফিল কোভিড নামেও একটি স্টাডি দেখিয়েছে কেবলমাত্র ভাইরাসের ভীতি থেকে কত মানুষ মানসিক অসুস্থতার কবলে পড়েছেন।

৪

মেয়েরা কি শুধু ঘরেই থাকেন? তা ত নয়? সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র মিলিয়ে, মেয়েরা তো আসলে শ্রমজীবী ভারতীয়ের এক বিশাল অংশ। গৃহে যে শ্রম তাঁরা দেন তা সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত ও উপেক্ষিত তো বটেই। গৃহের বাইরে গিয়ে তাঁরা অনেক সময়েই অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রম দেন ও সংখ্যাতত্ত্বের বাইরে থেকে যান।

তারপরে আসে সংগঠিত ক্ষেত্রে মেয়েদের অবদান।

২০০১-এর সেন্সাস বা জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট কর্মক্ষম জনগণের সংখ্যা ৪০ কোটি। তা গোটা দেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। এর ভেতরে ৩১.২ কোটি মূল কর্মী আর ৮.৮ কোটি হলেন প্রান্তিক কর্মী, অর্থাৎ যাঁদের তার আগের বছরে ১৮৩ দিনের ওপরে কাজ ছিল না।

কর্মক্ষম চল্লিশ কোটি মানুষের ভেতরে ১২.৭ কোটি মাত্র নারী। অর্থাৎ ২৫.৬ শতাংশ নারী আছেন ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে। মূলধারা আর প্রান্তিক কর্মীদের মধ্যে যদি তুলনা করি, দেখব, মূলধারায় মাত্র ২৩.৩ শতাংশ কর্মী হলেন মহিলা। অথচ প্রান্তিক ধারায় মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে কর্মী মহিলাদের ৮০ শতাংশই কিন্তু আসছেন গ্রাম থেকে। অর্থাৎ চাষবাসের কাজের সঙ্গে যুক্তদের একটা বিশাল অংশই যেমন প্রান্তিক ধারার, তাঁদের অর্ধেকের ওপরই মহিলা। শহরের কর্মীদের মধ্যে ঘরে ঘরে কাজ করার মহিলার সংখ্যাই বেশি।

এবারে আসি, সরকারি বেসরকারির হিসেবে। অবশ্যই এটা অর্গ্যানাইজড সেক্টরের কথা। লেবার ব্যুরো, কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০৫-এর একটি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৩০ লাখ মহিলা পাবলিক সেক্টরে কাজ করেন, আর ২১ লাখ মহিলা প্রাইভেট সেক্টরে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানের যথাযথতা কতখানি বলা মুশকিল। একটা অর্থে ধরেই নিতে পারি যে অর্গ্যানাইজড সেক্টরে যেটুকু যা মেয়েদের অংশগ্রহণ, সেন্সাসের মাধ্যমে বা অন্যান্য রিপোর্টিং এর মাধ্যমে তা ধরা পড়বে। কাজেই এই তথ্যটুকুকে কাজে না লাগিয়ে আমাদের উপায় নেই।

সাম্প্রতিক কিছু স্টাডিও বলছে, মেয়েদের অর্গ্যানাইজড সেক্টরে বেশি না আসার কারণ প্রথাগতভাবে বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা। এবং কিছু ক্ষেত্রে চাকরি ছেড়ে দেবে এই ভয়ে, তাদের প্রাইভেট সেক্টর ফার্মগুলি নিতে চাইছে না। অর্থাৎ একটা পঙ্কিল আবর্তের মতো কাজ করছে এই ব্যাপারটি। এর সঙ্গে সঙ্গেই ওই স্টাডি থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে কর্মক্ষম মহিলাদের (১৫ থেকে ৫৯ বয়সী) মাত্র ৬.৫ শতাংশ হাই স্কুল পাশ করেছেন। সুতরাং যে সব কাজে কলেজ-পাশের বিদ্যে দরকার বা কোনো বিশেষ কাজের দক্ষতার প্রশিক্ষণ দরকার এমন ভাল মাইনের চাকরি জুটবে না সেই সব মেয়েদের, যাঁরা সামান্য লেখাপড়া করেছেন। ফলত মেয়েরা অধিকাংশই কাজ করেন খুব খারাপ মাইনেতে।

আর সেখানেই লিঙ্গবৈষম্য মারাত্মক। সামাজিক সুরক্ষা থেকে শুরু করে ছুটিছাটার সুযোগ (বিশেষ করে মেটার্নিটি লিভ) বা অন্য কোনো রকম সুযোগ সুবিধা তো তাঁদের নেইই, এমনকি, সমান মেধা বা দক্ষতা সম্পন্ন পুরুষদের থেকেও তাঁরা অনেক কম মাইনে পান। যেখানে নিরক্ষর এক পুরুষের দিনমজুরি ১৭৭ টাকা, এক নিরক্ষর মহিলার মজুরি ৮৫ টাকা মাত্র।

জানার চেষ্টা করি, এইসব মেয়েরা কোথায় কাজ করছেন তাহলে?

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অরগ্যানাইজেশনের পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০০৯-১০ এই সময়কালে, এক লক্ষ গৃহ থেকে সংকলিত তথ্যের ভিত্তিতে, ভারতে নারী কর্মীর সংখ্যা, ১১.২ কোটি। (২০১১র জনগণনা অনুযায়ী দেশে নারীর সংখ্যা ৫৮ কোটি)। লক্ষ করব, আগেই যে তথ্য পেশ করেছি, তার ভিত্তি ছিল ২০০১-এর জনগণনা। সেখানে বলা

এর পর ৮ পাতায়

সাম্রাজ্যবাদী দ্বিচারিতা এবং ইউক্রেন আক্রমণ

৩-এর পাতার পর

বাইরে চলে যাবে। এর ফলে এক ধরনের জ্বালানি সঙ্কট ঘনীভূত হবে যা মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির কারণ হবে। মাথায় রাখা ভাল যে, বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির হার এমনিতেই একটু বেশি। পুতিন জানেন যে, তাঁর কৃতকর্ম বিশ্ব-অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করতে পারলে পশ্চিমী কেষ্টবিষ্টুরা তার বিরুদ্ধে কোন বড়সড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে বেশ কয়েকবার ভাববেন।

এই নাটকের রঙ্গমঞ্চ ইউক্রেন ২০১৪ সাল থেকে ন্যাটো ব্লকের করদরাজ্য হয়ে উঠেছে এবং পশ্চিমী সমর্থনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই নতুন ইউক্রেনে নয়া-নাৎসিদের গভীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে যেখানে সেনাবাহিনীর ফ্যাসিবাদী ব্যাটালিয়নগুলি প্রকাশ্যে স্বস্তিকা পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নাৎসিদের সহযোগী স্তেপান বান্দেরা, যার কমিউনিস্ট-বিরোধী মিলিশিয়ারা হলোকস্টে জড়িত ছিল, কার্যত কিয়েভের একজন রাষ্ট্রীয় সন্ত। দেশটি কয়েক ডজন গোষ্ঠীর (oligarch clan) ক্রীড়নক যারা পরিকল্পিত সোভিয়েত অর্থনীতির লুণ্ঠনের মাধ্যমে ফুলেফেঁপে উঠেছে। একদা সমৃদ্ধিশালী এই অঞ্চলের মাথাপিছু জিডিপি আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলার সমান। পশ্চিমী এবং রাশিয়ান উভয় মিডিয়াই ইউক্রেনের শাসক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে পশ্চিমপন্থী বনাম রুশপন্থী লেবেল দিয়ে থাকেন। বস্তুত এই দ্বন্দ্বগুলি হল সেদেশের বিলিয়েনারদের মধ্যে বিরোধ যার একদল বিশ্বাস করে যে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রাশিয়ার পদলেহনে সুনিশ্চিত হবে এবং আরেকদল একই কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসাদ পেতে আগ্রহী।

নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধ

এই সমস্ত ঘটনাগুলি কি আমাদের আবার ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের কূটনৈতিক ও সামরিক ছলাকলার সাথে বহু মিল থাকলেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের অন্যতম মৌলিক উপাদান — মতাদর্শগত পার্থক্য—আজ আর বিদ্যমান নয়। আরও খারাপ বিষয় হল, আজকের রাশিয়া পরমাগ্রহে বিশ্বায়িত এই নিয়ন্ত্রণমুক্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ। এর ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি রাশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তার জাতীয় সীমানার বাইরে নতুন নতুন বাজার এবং কাঁচামালের সোর্স প্রয়োজন। এই সম্প্রসারণ ঘটাতে গেলে তার সাথে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। আমরা জানি যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে ভৌগোলিক অঞ্চলে উদ্বৃত্ত পুঁজি জন্ম নেবে এবং স্বাভাবিকভাবে সেই পুঁজির বিনিয়োগের জন্য নয়া অঞ্চলের সন্ধান করা হবে। এর ফলে অনিবার্যভাবে অন্যান্য অঞ্চলের উপর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনৈতিক সংঘাতের সৃষ্টি হবে। এই মুহূর্তে আমরা দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘাতে রাশিয়ার সেই ভূমিকাই দেখছি যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চালিয়ে এসেছে—সরাসরি অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

একটি বর্বরোচিত আক্রমণ

ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের আক্রমণ একটি বর্বরোচিত অপরাধ যা শুধুমাত্র ইউক্রেন এবং রাশিয়ার জনগণের জন্য নয়, সমগ্র ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণি এবং বামপন্থীদের জন্যও মারাত্মক নেতিবাচক। হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ এই যুদ্ধে হতাহত হবেন। পুতিনের পূর্বসূরি বরিস ইয়েলতসিনের নির্দেশে ১৯৯৪-৯৫ সালে রাশিয়ার হাতে চেচনিয়ার গ্রোজনি শহর ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ার সামরিক-পুঁজিবাদ এলিটদের মানবতাবিরোধী চরিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। এই নৃশংসতা পুতিনের হাতে কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা, আমরা সিরিয়ার ওপর ২০১৫-১৭ সালে রুশ বিমান হানায় টের পেয়েছি। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ ইউরোপে এবং তার বাইরেও সামরিকবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করবে। এমনকি সমস্ত পশ্চিম দেশগুলি তাদের স্ব স্ব সামরিক বাজেট বৃদ্ধি করবে। রাশিয়ার শ্রমিকরা পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞার ফলে কঠোরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

অন্যদিকে আমরা দেখেছি যে, ন্যাটোর পূর্বদিকে সম্প্রসারণ এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি কতটাই অকার্যকর এবং বিপজ্জনক। ইউক্রেন নিয়ে সংঘাতে কোনও সামরিক সমাধান নেই বরং তার ফলে এই অঞ্চল দাউদাউ করে জ্বলতে পারে যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমরা আর দেখতে পাইনি। কোনরকম পারমাণবিক সংঘাতের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যার প্রভাবে ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। এই নির্মম যুদ্ধের একমাত্র ভুক্তভোগী কেবলমাত্র ইউক্রেন, রাশিয়া বা ইউরোপের মানুষ নয়, সমগ্র মানবতা।

বিশ্বপুঁজিবাদে চিন-রুশ অক্ষ

অবশ্যই এই যুদ্ধ যে অনেকের উপকারে লাগবে তা বলাই বাহুল্য। বিশ্ব-রাজনীতির মানচিত্র নতুন করে আঁকা হবে। রাশিয়া আরও বেশি করে চিনের দিকে ঢলে পড়বে। চিনের বহুদিনের চেষ্টা যে বাণিজ্যে ডলারের একাধিপত্য ভাঙবে। ইউক্রেন আক্রমণ তার হাতে এক সুবর্ণ সুযোগ তুলে দিয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক টার্নিং পয়েন্ট যার অনেকগুলো দীর্ঘস্থায়ী পরিণতি আছে। তাদের মধ্যে একটি দ্বিমেরু বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় রূপান্তর—একটি ডলারের উপর ভিত্তি করে, অন্যটি রেনমিনবিতে।

রাশিয়া এবং পশ্চিমের মধ্যে আর্থিক বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়াটি অবশ্যই কিছু দিন ধরে চলছে। ২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলের পরে পশ্চিমা ব্যাঙ্কগুলি রাশিয়ান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের এক্সপোজার ৮০ শতাংশ কমিয়েছে এবং রাশিয়ার বেসরকারি খাতে তাদের বিনিয়োগ মূল্য অর্ধেক হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত নতুন এবং আরও আক্রমণাত্মক নিষেধাজ্ঞা এই প্রক্রিয়াটিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এর ফলে রাশিয়া চিনের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হবে এবং চিনারা মার্কিন ও ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞার ফলে উদ্বৃত্ত রুশ তেল ও গ্যাস সস্তায় কেনার চেষ্টা করবে। অবশ্য চিন রাশিয়াকে সমর্থন করার জন্য মার্কিন বা ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করবে না, তবে অবশ্যই রুশ ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে চিনের আর্থিক বাজার এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও অ্যাক্সেসের অনুমতি দিতে পারে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, দুই দেশ ''সীমাহীন বন্ধুত্ব''-এর কথা ঘোষণা করেছে এবং রুশ অর্থনীতির জন্য পশ্চিমের দরজা যত বন্ধ হবে তত তারা চিনের দিকে ঝুঁকবে। ইতিমধ্যে ডলারের পরিবর্তে নিজ নিজ মুদ্রায় সমস্ত বাণিজ্য করার জন্য রাশিয়া এবং চিনের ২০১৯ সালে একটা চুক্তি করেছিল। ইউক্রেনের যুদ্ধ তা ত্বরান্বিত করবে।

গত কয়েকদিনে, চিন রাশিয়ান গমের উপর থেকে আমদানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে, সেইসাথে গ্যাজপ্রমের সাথে একটি নতুন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করেছে চায়না গ্যাস। অবশ্য রেনমিনবিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রায় পরিণত করার প্রক্রিয়া খুব সহজ নয়। চিন ডলারের হাত থেকে বেরোতে চায় তবে তারা তাদের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও চায়। এই অঙ্ক মেলানো খুব কঠিন। ডলার বিশ্বের রিজার্ভ কারেন্সি হওয়ার একটি কারণ হল মার্কিন বাজারগুলি উন্মুক্ত ও নিয়ন্ত্রণহীন। তবুও, চিন চেষ্টা করছে বৈশ্বিক বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ও রিজার্ভে রেনমিনবির অংশ বাড়ানোর জন্য। বাণিজ্য এবং পেট্রোপলিটিক্স তাদের কাছে বড় হাতিয়ার। চিনের আশা আগামী তিন থেকে চার বছরে রেনমিনবির অংশ ২ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে উন্নীত হবে। অবশ্য ডলারের তুলনায় তা কিছুই না। মার্কিন ডলার এখনও ৫৯ শতাংশ ধরে রেখেছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ হোক

পুতিনের রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে তার নিন্দা করতেই হবে। এই লড়াইয়ে কোন এক পক্ষ নেওয়া অযৌক্তিক এবং বিপজ্জনক। একইসাথে ন্যাটো বজায় রাখার এবং তা প্রসারিত করার নীতির বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলতে হবে।

কমেডিয়ান থেকে রাষ্ট্রপতি বনে যাওয়া ভ্লাদিমির জেলেন্সকি ইউক্রেনে অতি-দক্ষিণপন্থার প্রতীক ও অন্যতম বড় মাথা। ক্ষমতায় আসার পর অন্যান্য দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক অপরাধ ছাড়াও তার উদ্দেশ্য ছিল সরকারী সম্পত্তি জলের দলের ইউক্রেনীয় আলিগার্কির হাতে তুলে দেওয়া। তার জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে সেদেশের বামপন্থী ও সাধারণ মানুষের তীব্র ক্ষোভ ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পুতিনের এই অনৈতিক আক্রমণ তাঁকে দেশবাসী ও পশ্চিমী দুনিয়ার জনগণের কাছে অতি দ্রুত হিরো বানিয়ে তুলল। অতএব ইউক্রেনীয় সোশ্যালিস্টের মতো সেই সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে আমাদের সমর্থন করা প্রয়োজন যারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য পুতিনের বিরুদ্ধে, তাঁদের নিজের দেশের অগণতান্ত্রিক সরকার এবং লুঠেরা মাফিয়া আলিগার্কির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে এবং গ্রেপ্তারির ভয় সত্ত্বেও রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে হাজারে হাজারে মানুষ এই যুদ্ধের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে সেন্ট পিটার্সবুর্গে শত শত মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, জনতা স্লোগান দেয় 'যুদ্ধ নয়!'

বিক্ষোভের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং কঠোর শাস্তির হুমকি সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত ৪৪টি শহরে বিক্ষোভ দেখা গেছে। মস্কোয় বহু মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের হাতে মার খেয়েছেন ও গ্রেফতার হয়েছেন। বিক্ষোভ চলাকালীন এখনো পর্যন্ত ১৭০০ জনেরও বেশি লোককে আটক করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করতে অতিমারিকে ঢাল করেছে কিন্তু মানুষকে আটকানো যায় নি। সমাজের একাংশ স্পষ্টতই ইউক্রেনের সাথে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ অচিরে শেষ হবে এবং শান্তি পুনরাধিষ্ঠিত হবে। রাস্তায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত মানুষগুলিই আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ইউ টি ইউ সি'র পক্ষ থেকে ই পি এফ ও আইন সংস্কারের দাবি

আর এস পি প্রভাবিত কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন ইউ টি ইউ সি'র পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদীর সরকারের কাছে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের আওতায় আরও অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করার সুস্পষ্ট দাবি করা হয়েছে।

রাজ্যে ই পি এফ ও-এর সদস্য এবং ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় সম্পাদক অশোক ঘোষ ভারত সরকারের শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের কাছে অন্যান্য অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে একত্রে এই সব দাবি জানিয়েছেন। শ্রীঘোষ জোর দিয়েছেন অন্যান্য অসংগঠিত কর্মচারী যথা হোমগার্ড, আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, ১০০ দিনের কাজে নিযুক্ত কোটি কোটি গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষ এক প্যারা টিচারদের ই পি এফ ও-এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য। মোদী সরকার যদি এই প্রস্তাব মেনে নেয়, তবে আরও অতিরিক্ত কয়েক কোটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারী শ্রমের নিরাপত্তা এবং অবসরকালীন সুযোগসুবিধা পাবেন। এই দাবির সমর্থনে তিনি জানান যে ইতিমধ্যে বিহার রাজ্য সরকার ই পি এফ ও'র আওতায় এইভাবে অনেক অসংগঠিত কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইউ টি ইউ সি'র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি যে, এতদিন পর্যন্ত ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত এমন ছোটো সংস্থার কর্মচারীরাই এই সুযোগ ভোগ করতেন। অবিলম্বে ঐ ন্যূনতম সংখ্যাটি ১০ জনে নামিয়ে আনা হোক। এই মূল্যবান সংস্কারটি ই পি এফ ও'র আইনে গৃহীত হলে প্রায় ১৩ কোটি শ্রমজীবী মানুষ এই নিরাপত্তার আওতায় আসবেন। ইউনিয়ন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি রেখেছে যে, অবিলম্বে ই পি এফ পেনসন মাত্র ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম ৫০০০ টাকা করা হোক। এই দুর্মূল্যের বাজারে ১০০০ টাকা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়।

ধনকুবেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি

গর্ব হতেই পারে। হাড় হাভাতের শহর বলে কথিত এই কলকাতা নাকি ২০২০'র তুলনায় ৩ কোটি ডলারের (প্রায় ২২৬ কোটি টাকা) বেশি সম্পদশালী ধনকুবেরদের সংখ্যা বৃদ্ধির দৌড়ে সারা ভারতে প্রথম সারিতে রয়েছে। গত দু'বছরে—প্রচুর মানুষ কাজ হারিয়েছেন। দারিদ্র সীমার নীচে তলিয়ে গেছে বহু পরিবার। আর্থিক বৈষম্য বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। আমরা আরও গর্বিত (!) কোটিপতি জনসংখ্যার হিসাবে ভারত বিশ্বে তৃতীয়, আমেরিকা ও চিনের পরেই।

অবশ্য এমন কাণ্ডের জন্য করোনাই কেবল দায়ী নয়, করোনার আগেই দেশে বেকারত্বের হার চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছিল। অতিমারি কাজের জগৎকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা করুণ বললেও কম বলা হয়। ভয়ঙ্কর, আতঙ্কজনক। প্রসঙ্গত অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার রিপোর্ট থেকে জানা গেল দেশে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের হাতে রয়েছে জাতীয় সম্পদের ৪৫ শতাংশ, অপরদিকে নিচু তলার ৫০ শতাংশের ভাগে মাত্র ৬ শতাংশ। ৩ কোটি ডলারের বেশি সম্পদশালী ভারতীয়ের সংখ্যা ২০২১ সালে বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ, কলকাতায় ১১.৪ শতাংশ, সংখ্যার হিসাবে ধনকুবেরদের সংখ্যা ২০১৬ সালে ছিল ১১৯ জন, ২০২১ সালে বেড়ে হয়েছে ২৫৭ জন।

দুর্বৃত্ততন্ত্র টিকিয়ে রাখতে ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে মমতার গেম প্ল্যান

পার্থসারথি দাশগুপ্ত

সদ্য সমাপ্ত পৌরনিগম ও পৌরসভাগুলির নির্বাচনে দুর্বৃত্ত দলটির স্বেচ্ছাচারী নেত্রী বিরোধীশূন্য ফলাফলে কিছুটা নিশ্চিত। অর্থাৎ, ক্ষমতা ও নীচুতলা থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দুর্বৃত্তদলের স্বার্থে পুলিশ, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে যে অভ্যস্ত কায়দায় কাজে লাগানো যায় তা একশ শতাংশ করতে পেরেছেন। এরমধ্যেও গলার কাঁটার মতো বিঁধে আছে তাহেরপুর পৌরসভা। কারণ, সেখানে বামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। আপাতত আরো কয়টি পৌরসভা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলে থাকলেও, তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চিত যে অর্থক্ষমতা ও ভয়ভীতির কৌশলে সেই পৌরসভাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও দলবদলে বা তাঁর দলকে সমর্থনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে।

পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলি অর্থাৎ ২০১৯-এর লোকসভা এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে দেশি বিদেশি কর্পোরেট মিডিয়া বিজেপি বনাম তৃণমূলের যে বাইনারির রণকৌশল নিয়েছিল তা কার্যত সফল হয়েছে। এই বাইনারির কৌশল যে খুব সুচিন্তিত প্রকল্প অনুসারে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে নির্বাচনী আসরে মূল্যহীন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, পৌরসভাগুলির নির্বাচনী ফলাফলে তা সুস্পষ্ট। বিজেপি বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল, তারা আজ ভোটের শতাংশে তৃতীয় স্থানে গিয়ে নেমেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সার্বিক দুর্বৃত্তায়ন ও প্রশাসনিক সহায়তা তথা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের চোখ বুঁজে থাকা সত্ত্বেও বামগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ শতাংশের হিসেবে ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসছে।

অবশ্য সংসদীয় গণতন্ত্রে, বিশেষ করে, বর্তমান যুগে ঢালা কর্পোরেট অর্থ ও পেশীশক্তি অধ্যুষিত ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বামপন্থীরা কতটুকু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে বা আদৌ পারবে কিনা, সেই রণকৌশলটি ক্রমশই মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। তাই অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতায় আপ্লুত হয়ে একদিন না একদিন বামপন্থীরা সেই স্বর্ণমৃগের সন্ধান পাবে—এই বোধ আজ অর্থহীন। আর একদল রাজ্যের বামফ্রন্ট বিরোধী বামপন্থীরা যাঁরা বিধানসভা-লোকসভা নির্বাচনে মমতার জয়কে মানবিকতার জয়-ধর্মনিরপেক্ষতার জয় বলে জনবাদী কৌশলে দু'হাত তুলে নৃত্য করেছিলেন তাদেরও উল্লসিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। দুর্বৃত্তায়ন ও জনবাদের ককটেলে পৌরনির্বাচনে বিজেপি তৃতীয় স্থানে নেমে যাওয়া এবং নিজেরা দিশাহীন হয়ে না ঘাটকা না ঘরকা অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ায় তাদের বিজেপি'র পরাজয়কে নতুন করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি বলে তৃণমূলকে আবাহন করার দিনও দ্রুত অস্তমিত।

বামফ্রন্টকে বামপন্থী এবং বামফ্রন্টের বাইরে অবস্থানকারী বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়েই বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রেণি রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে কোন বাম গণতান্ত্রিক শক্তির অবক্ষয়ের অর্থই এরাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ভিত্তি মজবুত হওয়া। আর এরাজ্যে দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত এবং বহুরূপী গিরগিটির মতো রঙ বদলাতে পারঙ্গম এই চতুর দলটির কৌশল ও নীতিসমূহ বোঝার পক্ষে বিগত এগারো বছরই যথেষ্ট। প্রয়োজনে রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের ধারাবাহিকতাজনিত গরিব খেটেখাওয়া মানুষের বন্ধু হওয়ার ভণ্ডমি এবং অভিনয়টা ভালই রপ্ত করেছেন মমতা ব্যানার্জী।

উৎপাদনী শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও বাজার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক লগ্নিকারী সংস্থাগুলির থেকে ধার নিয়ে একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প দিয়ে মানুষের মন জয় করাটাও ভালই শিখেছেন। যাত্রা উৎসব, মাটি উৎসব, প্রতিমা বিসর্জনের কার্নিভাল, মৌলানা পুরোহিতদের অর্থসাহায্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিভিন্ন শ্রী-প্রকল্প, ক্লাবগুলিকে নিয়মিত অনুদান ইত্যাদি করে ক্রমশ অরাজনৈতিক শ্রেণি নিরপেক্ষ জনভিত্তি নিশ্চিত করাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। অথচ প্রতিটি সরকারী দপ্তরে হাজার হাজার শূন্যপদ পূরণ না করা, সরকারি কর্মচারীদের ডি এ ও পেনশন বকেয়া রেখে দেওয়া, চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি না করা ও অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তামূলক অধিকার সঙ্কুচিত করা চলছেই। এই নিদারুণ বঞ্চনার বিষয়টি অস্পষ্ট করে জনবাদী প্রকল্পকে প্রচারের আলোয় আনার ক্ষেত্রে সম্মতি ও ন্যায্যতা নির্মাণ করে চলেছে একদল প্রাক্তন নকশালপন্থী ও মেকি বামপন্থী আঁতেল গোষ্ঠী।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও গ্রামীণ দুর্বৃত্ততন্ত্র

একটি নিষ্ঠুর সত্য বামদলগুলিকে স্বীকার করতেই হবে যে, বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ এবং তৃণমূলের ১১ বছর অতিক্রান্ত হবার পর অর্থাৎ প্রায় পাঁচ দশক এ রাজ্যে এবং সারা দেশে গঙ্গ-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে ভূমি সংস্কার (তা যতই অসম্পূর্ণ হোক) এবং ভূমিহীন চাষিদের জমি বন্টন সহ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বনিম্ন স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভাবাবেগ এবং গ্রামের তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যে তার প্রভাব প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে।

বরঞ্চ আমাদের রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের কাছে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দশকে পঞ্চায়েত ও মফস্বলের পৌরসভাগুলিতে স্কুল কমিটি, বাজার সমিতি, কো-অপারেটিভ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচনে অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেনিফিসিয়ারী ভিত্তিক দলতন্ত্র কিছুটা বিস্তার লাভ করছিল। এই আনুগত্যের চক্রে লুম্পেনদের প্রবেশ শুরু হলেও নিরঙ্কুশ আধিপত্য সৃষ্টি হয় নি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বের পর বামফ্রন্টের দলগুলির গ্রামীণ তথা কৃষক সংগঠনগুলির বদলে যাওয়া শ্রেণিবিন্যাসের ফলে বেনিফিসিয়ারী এবং দুর্বৃত্তদের একটি বড় অংশ বুঝতে পারল যে ক্ষমতার মঞ্চটি ঘুরে চলেছে। নতুন শক্তির পাশে, নীতি আদর্শহীন ক্ষমতার বৃত্তে প্রবেশ করতে হবে। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে উল্লসিত হয়ে উঠল জমি হাঙ্গরের দল ও নিম্নমানের কর্পোরেট জগৎ। নতুন গরিবের বন্ধু আবিষ্কার করল তারা স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্তদল নেত্রী ক্ষমতালিপ্সু মমতা ব্যানার্জীর মধ্যে।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গ্রাম থেকে শহরে, পুলিশ-আমলাসহ প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্বৃত্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের বিষয়টি স্বেচ্ছাচারী নীতিহীন নেত্রীর অনুপ্রেরণায় সর্বজনীন মাত্রায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ সর্বাধিনায়িকা এবং তাঁর নিকটবর্তী চক্রের আশীর্বাদে অনুগত ব্যক্তি, সে নেতা হোক, আর প্রোমোটার-পুলিশ-আমলা মায় নির্বাচন কমিশন হোক, সহস্র অপরাধ খুন জখম লুঠ, সাক্ষী ও সাক্ষ্য লোপাট, ধর্ষণ, বিরোধীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে গ্রামছাড়া ইত্যাদি যে অপরাধ ও দুর্নীতিই করুক না কেন, পার পেয়ে যাবে। মমতা ব্যানার্জী এভাবেই দুর্বৃত্ততন্ত্র, সরকারি অর্থ লুঠ করে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার অবদমন করে তাদের একা জনবাদী প্রকল্পের প্রাপক হওয়ার প্রতিযোগিতা বজায় রেখে দুর্বৃত্ত-প্রোমোটার- ঠিকাদার, আমলা পুলিশ নেতাদের শৃঙ্খলটি টিকিয়ে রাখছেন। এক অদ্ভুত নেতিবাচক হেজিমনি নির্মাণ করেছেন একদল প্রাক্তন বামপন্থী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রশাসনিক ক্ষমতা দান ও বিভিন্ন পুরস্কারের দয়াদাক্ষিণ্যে।

২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে মমতার গেমপ্ল্যান

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দখল করা যে মমতা ব্যানার্জীর স্বেচ্ছাচারী সরকার টিকিয়ে রাখার তুরুপের তাস তা বোঝা গেছে ২০১৩ এবং ২০১৮র পঞ্চায়েত নির্বাচনে। ২০১৮ সালে ৩৪ শতাংশ সর্বস্তরে পঞ্চায়েতে বিরোধী প্রার্থীর অনুপস্থিতি এবং বাকীগুলিতে নমিনেশন দেওয়া থেকে শুরু করে একেবারে ভোটগণনার দিন পর্যন্ত দুর্বৃত্ততন্ত্রের সহায়তায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখল স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিম্নলিখিত কারণে আরো উন্নত কায়দায় সেই রণকৌশল নিতে চলেছেন মমতা ব্যানার্জী তাঁর পরামর্শদাতাদের সহযোগে।

(১) রাজ্যবাসীর অধিকাংশ গ্রামীণ এলাকার ভোটার। গত ২০১৮র পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভয় সন্ত্রাস, খুন, জখম ও লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কেনা বেচা করে তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থীরা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষকে ভোটের লাইনে দাঁড়ানোর কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নমিনেশন পেপার দেওয়ার সময় ২৫ শতাংশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা আসেনই নি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪ শতাংশ। মনোনয়ন পর্ব শেষ হওয়ার পর নিজেদেরই নির্দল প্রার্থীদের সঙ্গে প্রহসন চলে ১৬ শতাংশ আসনে। অর্থাৎ কার্যত ৫০ শতাংশ আসনে পঞ্চায়েত নির্বাচন কিছুটা হলেও হয়েছে।

পরবর্তীকালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি দীপক মিশ্র ও এম খান্ডেলকর এবং চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য নির্বাচন কমিশন, আমলাদের একাংশ এবং পুলিশ সহ দুর্বৃত্তদের সহায়তায় গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। এই সব মন্তব্য বা বক্তব্যে মমতা ব্যানার্জীর যে কিছু আসে যায় না বিগত পৌরসভা/পৌরনিগমের ভোটে তাই প্রমাণিত হয়েছে।

(২) সর্বভারতীয় কৃষি সংকট থেকে পশ্চিমবঙ্গ রেহাই তো পায়ই নি বরং রাজ্যে ছোট চাষির সংখ্যা সর্বাধিক হওয়ায় এদের কাছে ফসলের দাম নেই, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা নেই বরং মাইক্রোফিনান্সের নিপীড়ন আছে, সার পাম্পের তেল, বীজ কীটনাশকে ভরতুকি কমে দাম বেড়ে গেছে ও চোরাকারবারি বেড়েছে। আর যাদের জমি আছে তারা অর্থকরী ফসল বা মাছের ভেড়ির দিকে একধরনের জুয়ায় ঝুঁকছে। চাষিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ফলাও বিজ্ঞাপনে ক্ষতিপূরণের প্রচার করলে সেই অর্থ পৌঁছাচ্ছে না, তৃণমূলী দুর্বৃত্তদের কাটমানি দিতে হচ্ছে। বিভিন্ন আবাস যোজনা থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরের অনুদান থেকে কমিশন দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ লুম্পেন বৃত্তির মাধ্যমে উপার্জনের ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য পঞ্চায়েতে ক্ষমতা দখল করে রাখলে গ্রামীণ বেকারত্বের সাময়িক সমাধান এবং লুম্পেনতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পাহারাদার পাওয়া যায়।

আর গত দু'বছরে ঘরছাড়া বহু অসংগঠিত গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ কোভিড-১৯-এর লকডাউনের সময় গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের অনেককেই সেই বিভিন্ন প্রকল্প, ১০০ দিনের কাজ বা সরকারি অনুদানের উপর নির্ভর করতে হবে। গ্রামীণ বেকারত্ব বাড়লে এই দুর্বৃত্ততন্ত্র আরও ছড়িয়ে পড়বে। আর যত ছড়িয়ে পড়বে ততই পঞ্চায়েতকে আরো শক্ত করে কব্জা করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

(৩) বিগত পাঁচ-ছয় বছর প্রতিটি নির্বাচনেই তৃণমূল বনাম বিজেপি'র বাইনারি রাজ্যবাসীর মনে ভালোভাবেই জায়গা খুঁজে নিয়েছিল। লুম্পেন কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অনেকেই বিজেপিতে ভিড়েছিল। আবার গ্রামাঞ্চলের মানুষদের অনেকেই ভেবেছিলেন যে তৃণমূলকে শায়েস্তা করতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয়ে আরও বড় দুর্বৃত্ত এবং কর্পোরেট অর্থে চালিত হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি। আসলে বামপন্থীদের ভোটের ময়দান থেকে গুরুত্বহীন করাই ছিল দুটি দলের মিলিত কৌশল। এখন অধিকাংশ দুর্বৃত্ত নেতানেত্রীরা শিবির বদলে মমতার পদতলে আশ্রয় নেওয়ার পর সেই বাইনারির গুরুত্ব যথেষ্ট কমেছে। এবার একমাত্র বিকল্প যে বামগণতান্ত্রিক শক্তি তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে দেখে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সন্ত্রাস ও ভোটে জালজুয়াচুরি আরো বেশিমাত্রায় করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

ইতিমধ্যে আনিস খানের হত্যার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে ছাত্র যুব আন্দোলনে গতি আসা এবং তাকে দমন করার পাশাপাশি পুলিশ-আমলা-বিচার ব্যবস্থা সহ 'সিট'কে প্রভাবিত করছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

(৪) পুরোপুরি ঢিলেঢালা অডিট তথা নজরদারি এবং পঞ্চায়েতের খরচের উপর নিয়মিত নজর রাখার আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কম করে বছরে গড়ে ১০ কোটি টাকা খরচের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় যে করেই হোক পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর দখলদারি করতেই হবে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ও তাদের পোষা দুর্বৃত্তদের।

অর্থাৎ গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের যে অংশ ১০০ দিনের কাজে নিযুক্ত হয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জন্য যে প্রায় চার কোটি টাকা খরচের অধিকার আছে, বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে স্বচ্ছ ভারত মিশনের যে টাকা আসে কার্যত অডিট না হলে এই টাকার বৃহত্তর অংশই লুঠ হয়ে যায়।

এছাড়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা ইত্যাদি খাতেও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বছরে ৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়। স্থানীয় ঠিকাদারদের ডেকে এই সব কাজে টেন্ডার দেয় পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি সহ আধিকারিকরা এই কাটমানির ভাগ নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকাদারদের প্রজেক্টের ৩০ শতাংশ কমিশন দিতে বাধ্য করা হয়।

(৫) সারা দেশে বিজেপির উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকল্পে এরাজ্যে এক দল ধনী দুর্বৃত্ত সংখ্যালঘু ও মমতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত আঁতেলদের ও কর্পোরেট প্রচারযন্ত্রের সহায়তায় সংখ্যালঘুদের মেশিহা হয়ে ভোটের মেরুকরণ করেছে দুটি দল। এর মধ্যে রাজ্যে সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের মুখ আনিস খানকে হত্যার পর মমতার সংখ্যালঘু প্রেমের মুখোসটা খুলে গেছে। একথা নিশ্চিত যে, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনে অখিলেশের জন্য প্রচারে গিয়ে মমতা তার বিজেপি বিরোধী মুখোশটায় রং লাগাতে ব্যস্ত। ইউপির নির্বাচনে ফলাফল দেখলে বোঝা যাবে বিজেপি কতটা আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী হয়ে উঠবে। যত আগ্রাসী হবে—ততই মমতার পঞ্চায়েত নির্বাচনে আখের গোছানোর সুবিধা। নতুন কোনো উপায়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের খেলায় মাতবে দুটি দল।

মমতা ব্যানার্জীর সরকার যতই গলা ফাটাক না কেন, গত পাঁচ বছরে পাঁচ দশকের বেকারত্বের রেকর্ড ভেঙে পড়েছে। এরপর একের পর এক চা বাগিচা, চটকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে শ্রম দপ্তর কার্যত ধর্মঘট অবস্থান বেআইনি করে দেওয়া এবং তৃণমূল অনুমোদিত ইউনিয়নগুলি মালিক পক্ষের নির্লজ্জ দালালি করায় কলকারখানাগুলি ধুঁকছে। তাছাড়া নোটবন্দী, জিএসটি এবং করোনা রুখতে লকডাউনের ফলে অজস্র ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মমতা ব্যানার্জীর বিশ্ব বাংলা আহূত শিল্প সম্মেলনগুলিতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের গল্প ফানুস হয়ে উড়ে গেছে। এদিকে সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরি নেই। শিক্ষক নিয়োগ নেই। যতটুকু হয়েছিল তাও দুর্নীতির অভিযোগে হাইকোর্টের নির্দেশে বন্ধ। এই বেকারত্বের সুযোগটাও হাতছাড়া করছে না তৃণমূল নেত্রী। অতিশয় নিম্নমানের মজুরিতে, পঞ্চায়েত পৌরসভা, কিছু পরিষেবা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে বেছে বেছে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের চাকরি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শুধুমাত্র আনুগত্যের বলয়টাকে ধরে রাখার জন্য। একজনের চাকরি হলে দশ জন কমপক্ষে সেই চাকরির লোভে বিরোধিতা করবে না বা আরো বেশি অনুগত হয়ে পড়বে।

Vol. 68 Issue No. 46 শনিবার ৫ মার্চ ২০২২ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

এই মুহূর্তে ভারতের মেয়েদের অবস্থান

৫-এর পাতার পর

হয়েছে নারী কর্মীর সংখ্যা ১২.৭ কোটি। অর্থাৎ ২০০১-এর জনগণনার চেয়ে ২০১০ এর রিপোর্টে নারী কর্মীর সংখ্যা কম দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, মূলত কোথায় কাজ করেন এঁরা?

১। চাষবাস, পশুপালন—৬৮ শতাংশ।

২। তামাক শিল্প, বস্ত্র শিল্প, দর্জির কাজ—১০.৮ শতাংশ

৩। গৃহনির্মাণ কাজ (মূলত ইট, বালি ইত্যাদির বহনের শ্রমিক হিসেবে)—৫ শতাংশ।

৪। ইস্কুল/কলেজ—বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত থাকা—৩.৮ শতাংশ।

৫। মুদি-দোকান দেওয়া (চাল, ডাল, তেল খুচরো সবজি এবং পান সিগারেটের দোকান দেওয়া) ২.১ শতাংশ।

৬। গৃহকর্ম (ঝাড়পোঁছ, বাসন মাজা, কাপড়কাচা প্রভৃতি) ১.৬ শতাংশ।

৭। ব্যক্তিগত সেবা (ম্যাসাজ, বিউটি ট্রিটমেন্ট, বেবি সিটিং ইত্যাদি) ১.৫ শতাংশ।

৮। স্বাস্থ্য সেবা ১.১ শতাংশ।

৯। ব্যুরোক্রেসি (সরকারি চাকরি) ১ শতাংশ।

লক্ষণীয় যে, চাষবাস থেকে শুরু করে নির্মাণ ও শিল্প সর্বত্রই সামান্য হলেও মেয়েদের যোগদান গত দশবছরে কমে এসেছে দেখা যাচ্ছে। এমনকি গৃহকর্মের ক্ষেত্রেও মেয়েদের যোগদান কমেছে সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে। দুই শতাংশ থেকে নেমে ১.৬ শতাংশ। একমাত্র ব্যুরোক্রেসিতেই, ০.৭ শতাংশ থেকে উঠে গেছে ১ শতাংশ-এ!

৫

এক দুস্তর ব্যবধান সর্বত্র। মেয়েদের চাকরিক্ষেত্রে মাইনে কম, নিরাপত্তা কম এবং যে কোনো মুহূর্তে যৌন হেনস্থা হবার সম্ভাবনা। গৃহেও তারা নিরাপদ নয়, এমনকি, ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়ের থেকেও শারীরিক নির্যাতন হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তথাপি, লড়াই জারি আছে। প্রতি নারী শক্তিমতী, লড়াকু। পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয় আইন সরকার পুলিস। কতটা সত্যিই তারা নারীর পাশে থাকতে পারে বা পেরেছে তা অবশ্য প্রশ্নাকুল। কারণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ এ ধারার অপব্যবহার সম্পর্কেও আইনি সংস্থারা নিজেরাই ওয়াকিবহাল। একদিকে বধূ নির্যাতন অব্যাহত, অন্যদিকে নির্দোষ শ্বশুরবাড়িকে হেনস্থা করতে কিছু মেয়ের পরিবার এই আইনকে অপব্যবহার করেছে দিনের পর দিন। ফলত লঘু হয় গিয়েছে বিষয়টি, ভোঁতা হয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রটি।

১৯৮৩ তে ৪৯৮ এ আমদানি হয় আর ২০০৫ এ গৃহহিংসা আইন। দেখা গেছে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট নামে পরিচিত ২০০৫-এর আইন এতটাই জটিল যে তাকে কার্যে পরিণত করা দূর অস্ত।

ইমপ্লিমেন্টেশনের জটিলতাটি দুর্বহ। জাতীয় ল কমিশন, ২০১২ তে ৪৯৮ এ ধারার ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ে একটি ডিটেইলড রিপোর্ট দেন। সেখানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট ও এই আই পি সির ৪৯৮ এ-র তফাত বোঝানো আছে। দুটোকে ঘেঁটে ফেললে চলবে না। গৃহহিংসার আইন আসলে বাড়ির ভেতরে যে কোনো ধরনের হিংসার ঘটনায় মেয়েদের সুরক্ষা দিতে তৈরি হয়েছিল। সুতরাং এই আইনে নারীর শারীরিক ও মানসিক আঘাত থেকে মুক্ত থাকার অধিকারকে ফৌজদারি (ক্রিমিনাল) নয়, বরং বেশি করেই দেওয়ানি (সিভিল) আইনের ক্ষেত্র বলে দেখা হচ্ছে। তবে কিছু শাস্তিযোগ্য ধারা এখানে অবশ্যই আছে। কিন্তু গৃহহিংসা এখানে অনেক বিস্তৃত ভাবে সংজ্ঞায়িত। এই বিশাল বিস্তৃতির ভেতরে আবার, ৪৯৮এ ধারার আওতায় পড়ে যে যে অত্যাচার, সেগুলোও আছে। তথাচ এখানে মূল অভিমুখ হল মেয়েদের সুরক্ষা দেওয়া, তার জন্য একটি অনুপুঙ্খ বিস্তারিত পদ্ধতি বলা আছে। প্রোটেকশন অফিসার তৈরি করে মেয়েটির ওপর নজর রাখার কথা আছে এই আইনে। গৃহহিংসার ঘটনার ওপর রিপোর্ট তৈরি করা, নির্যাতিতার ওপর নজরদারি করা, তার কেসকে এগিয়ে নিয়ে চলা এসব করবেন সেই সুরক্ষা আধিকারিক। এই জটিল আইনি গোলকধাঁধা গত ১৫-১৬ বছরে এ রাষ্ট্রের ছাপ্পা পেলেও, দেশের মেয়েদের মনের দুয়ারে পৌঁছতে পারেনি।

আমাদের দেশে যে পরিমাণ আইন হয়েছে, সে পরিমাণে হয়নি সামাজিক আন্দোলন। ষাটের দশকে সত্তরের দশকে অব্দি যে সামাজিক আন্দোলনের কথা শোনা যেত, মানুষকে শিক্ষিত করার যে প্রয়াস গোষ্ঠীভিত্তিকভাবে নেওয়া হত, সেই প্রচেষ্টাগুলি যেন ক্রমক্ষীয়মান। আবার সেই পথেই এগুনো প্রয়োজন। নাহলে মেয়েদের অবস্থা ক্রমশ আরো দুর্বহ হবে। হাতে অনেক প্রযুক্তি আসবে কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহারের বলিও হবেন মেয়েরা। যেভাবে ভাইরাল পর্ণ ভিডিও ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হয় সেইরকম। অথবা উঁচু স্তরের যন্ত্রপাতির সহায়তায়, চিকিৎসা শাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতির পরেও, যে ভাবে মারাঠাওয়াড়া থেকে শুরু করে দেশের নানা অংশে, একের পর এক বেআইনি কন্যাভ্রূণ হত্যার র‍্যাকেট বা দুষ্টচক্র ধরা পড়ে যাচ্ছে তা, গভীর উদ্বেগের। যে দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও" স্লোগান দিতে হয়, যে স্লোগানের পরেও উন্নাও থেকে হাথরস ধর্ষিতা মেয়েদের নিথর মৃতদেহ ঝুলে যায় গাছের ডালে, সেই দেশে নারীর লড়াই নারীর একার হতে পারে না কখনো। এক বিশাল জঙ্গলের মতো আমাদের বদ্ধমূল নারীবিরোধী মানসিক গঠন। তা থেকে ধর্মান্ধতা-অপপ্রচার-অতি- আচারের অজস্র ডালপালা ছেদন করতে করতে নারীর অধিকারের পথটি কেটে বের করতে হবে।

মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস...

১-এর পাতার পর

কিছু করতেই পারে না। সন্দেহের তীর হাওড়া গ্রামীণ এস পি'র দিকে। নবান্ন ঘনিষ্ঠ এই পুলিশপুঙ্গব সব কিছুই পারেন।

হাওড়ার পাচলায় এস পি ও দপ্তরের সামনে বাম ছাত্র যুবদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশের ওপর পুলিশ জঘন্য আক্রমণ করে। গ্রেপ্তার করা হয় ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক কম. মীনাক্ষী মুখার্জী সহ আরও বেশ কয়েকজন। এদের ওপর থানায় এবং কারাগারে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। আনিস খানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে কম. মীনাক্ষী মুখার্জীর মতো গণ আন্দোলনের নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে নবান্ন হিংস্র আচরণ করে চলেছে।

রাজ্য বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ আমতার দক্ষিণ সারদাগ্রামে নিহত আনিস খানের বাড়িতে পৌঁছে তাঁর পিতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের সুবিচারের জন্য বামপন্থীরা যে লড়াই চালিয়ে যাবে, সেই আশ্বাস দিয়ে আসেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান কম. বিমান বসু। আরএসপি'র পক্ষে ছিলেন কম. অশোক ঘোষ এবং কম. মনোজ ভট্টাচার্য।

২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আনিস খানের খুনীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। বামফ্রন্টের রাজ্যস্তরের বাম নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল শেষে লেনিন মূর্তির পাদদেশে একটি স্বল্পকালীন বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান কম. বিমান বসু। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিপিআই (এম) এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। সিপিআই রাজ্য পরিষদের সম্পাদক কম. স্বপন ব্যানার্জী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কম. হাফিজ আলম চৌধুরী, মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কম. জয়হিন্দ সিং এবং আর এস পি'র পক্ষে কম. মনোজ ভট্টাচার্য।

ইউক্রেন-এর বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে আর এস পি'র বক্তব্য

আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটি রাশিয়ার ইউক্রেন-এর বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ প্রসঙ্গে গভীর উৎকণ্ঠা এবং চিন্তা ব্যক্ত করেছে। বহু সংখ্যক জীবন নিষ্ঠুরভাবে বিধ্বস্ত করার ঘটনাবলী সংঘটিত হতে চলেছে। এই যুদ্ধ অবশ্যই মানবতা বিরোধী।

আর এস পি মনে করে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের মর্যাদা এবং মৌলিক দাবি আদায় করার 'ন্যায় যুদ্ধ' ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধেরই তীব্র বিরোধিতা করা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের একান্ত কর্তব্য। বর্তমান যুদ্ধ অনতিবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। কোনভাবেই এমন যুদ্ধ মানবকল্যাণে মেনে নেওয়া যায় না। এই যুদ্ধ নিঃসন্দেহে ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধের প্রচণ্ড ঝুঁকি বহন করে। কোনভাবেই এমন এক যুদ্ধের আয়োজন চলতে পারে না।

আর এস পি যুযুধান দুই পক্ষকেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কিত প্রশ্নগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান করার জন্য আবেদন জানায়। ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার পরিহার করে শান্তির সন্ধান করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এমন যুদ্ধ চালানো সমীচীন নয়।

বিগত প্রায় দুই বছর ব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারির বিশ্বব্যাপী মানব সমাজ বিপর্যস্ত। এই গভীর সংকট থেকে এখনও পূর্ণ পরিত্রাণ সম্ভব হয় নি। এমন এক পরিস্থিতিতে কোনও এক রাষ্ট্রনায়কের মানসিক বিকার বা জেদ পূরণ করার লক্ষ্যে এমন যুদ্ধ চলতে দেওয়া যায় না। আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, বর্তমান মারণাত্মক অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। এমন এক ভয়াবহ সশস্ত্র সংঘর্ষ শুধুমাত্র ইউক্রেন বা রাশিয়ার জনজীবনকেই চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, সমগ্র বিশ্বের মানুষও এর ফলে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হবে।

বিগত বেশ কিছু বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক আগ্রাসী পুঁজিবাদের গভীর সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ সন্ধানে বিশ্বপুঁজিবাদ সম্পূর্ণত ব্যর্থ। সংকট মুক্তির ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ আবার এক মহাযুদ্ধের চক্রান্তে লিপ্ত। এর ফলে আমাদের বিশ্ব পুনর্বার এক চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি। এমন পরিস্থিতি কোনভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ইউক্রেনের নানা প্রান্তে বসবাস করার ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্যদের অবিলম্বে উদ্ধার করতে হবে।

রাশিয়ার ইউক্রেন বিরোধী আতঙ্কজনক ও বিধ্বংসী যুদ্ধ আরও দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গ হয়ে পড়েছে। বিগত কয়েকদিনের যুদ্ধে অসংখ্য প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে মানবজীবনের সংকট ঘনীভূত হয়েছে। অতি গভীর পরিতাপের বিষয় যে, এই যুদ্ধ আমাদের দেশ, ভারতের আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বিষয়ে লজ্জাজনক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আমরা লক্ষ করছি যে, পোল্যান্ডের মতো একটি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় দেশ পর্যন্ত ভারতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে। ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুদ্ধ ভয়ে পালিয়ে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষকে ইউক্রেন-পোল্যান্ড সীমান্ত অতিক্রম করতে দেওয়া হচ্ছে না। ভারতের বিদেশ নীতি কোথায় অবনমিত হলে এমন এক পরিস্থিতি নির্মিত হয় তা, ভাবলেও শিহরিত হতে হয়। কয়েক সহস্র ভারতীয় তরুণ যারা ইউক্রেনে লেখাপড়া করতে গেছে তারা এক ভয়াবহ বিপর্যস্ত অবস্থায়। কিভাবে এবং কবে নিরাপদে ভারতে ফিরতে পারবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে দিবানিশি উৎকণ্ঠার মধ্যে এই ছাত্রছাত্রীরা বেঁচে আছেন। এত সংখ্যক উৎকণ্ঠিত তরুণ-তরুণীকে দেশে ফিরিয়ে আনার কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা এখনও লক্ষ করা যাচ্ছে না।

ভারতের মোদি সরকার এ প্রসঙ্গে বস্তুতপক্ষে এখনও উদাসীন এবং কিংকর্তব্যবোধহীন। কয়েক সহস্র ভারতীয় ছাত্রছাত্রী যখন ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতায় জীবন রক্ষার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তখনও মোদি সরকার বিজ্ঞাপনী চমক এবং মোদি স্বয়ং তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে তাঁর মুখচ্ছবি প্রদর্শনে মত্ত। এই মানবিক সংকট নিরসনে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে ব্যর্থ। এ এক গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে নিরাপদে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নেও মোদি সরকার 'জুমলা'র আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইউক্রেনে বসবাসকারী ভারতের বহু নাগরিক প্রাণ হাতে করে যত্রতত্র দৌড়ে মরছে। আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য গত ১ মার্চ একটি কঠোর ভাষায় বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছেন যে, এমন এক বিরূপ অবস্থায় দেশের সাধারণ নাগরিকদের দুর্দশা বরদাস্ত করা কখনোই সম্ভব নয়। দেশের ঐক্যবদ্ধ মানুষদের এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরে তীব্র প্রতিবাদ ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভারত সরকারের এহেন কুৎসিত এবং সংবেদন- শীলতাহীন মনোভাব কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

আর এস পি দাবি জানাচ্ছে যে, ভারত সরকারকে অনতিবিলম্বে যথাযথ বা নিরাপত্তাযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে সমস্ত ভারতীয়দের নির্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়ে আনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-